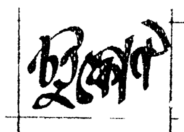
ভানুমতির খেল

প্রদ্যোৎ গুহ



৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

প্রকাশক :
দেবীপ্রসাদ গুহ
৮৯ এ, যতীন্দ্রমোহন এ্যাভিন্যু
কলিকাতা

মুদ্রাকর :
নীরদরঞ্জন চৌধুরী
প্রকাশিকা লিঃ
(নববিধান প্রেস)
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

প্রাপ্তিস্থান :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
১২ বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রিট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৫৯

দাম : দুই টাকা

মা ও বাবাকে



ভানুমতির খেল

ভানুমতির খেল…

মেলার মধ্যে এই বেখাপ্পা তাঁবুটার আকর্ষণই সব চাইতে বেশি। ভিড় জমেছে চারিদিকেই। কৌতূহলী চোখ তাঁবুর ছিদ্র খোঁজে।

প্রতি বছরই এই সময় মেলা বসে। নানাবিধ পণ্যের বিচিত্র বিপণী, নানারকম মানুষ আর ডে-লাইটের আলোয় সজীব হয়ে ওঠে রানীডাঙার মাঠ। আশে-পাশের চাষীদের গাঁ ভেঙে মানুষ আসে মেলা দেখতে।

নাগরদোলার আকর্ষণটা কোনরকমে কাটান গেছে। স্বামীর কোঁচার খুঁট শক্ত করে ধরে গ্রামের যে অল্প-বয়সী মেয়েটি এসেছিল মেলা দেখতে, ভীরু চোখ মেলে সেও আবদার না জানিয়ে পারল না:

খেলা দেখাইবা? ছোটকালে একবার দেখছিলাম—বড় ভাল করে।

খেলা দেখবা? নিরাশ করতে ইচ্ছা করে না মেয়েটাকে। তা'ছাড়া মানুষটার নিজের আকর্ষণও কম নয়।

মেলা বসে ধান ওঠবার পর। সুতরাং এ সময়টা হাতেও পয়সা থাকে।

আসেন আসেন—মাত্র দুই পয়সা—বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর প্রফেসার মনতোষ হালদারের ভানুমতির খেল—আসেন—আসেন দেরি করলে জায়গা পাইবেন না।

মাত্র দুই পয়সা! নিরাশ করতে ইচ্ছে করল না মেয়েটাকে।

বাইরে বিচিত্র পোষাক পরিহিত লোকটা তারস্বরে চিৎকার করেই চলেছে।

ভিতরে খেলা সুরু হয়ে গেছে।

ডুগডুগ্—ডুগডুগ্

ডুগডুগি বাজিয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেন প্রফেসার মনতোষ হালদার। ছেয়ে রঙের ছোপধরা কালো কোট। বুকের ওপর সেফটিপিন দিয়ে লটকানো চীনে বাজারে কেনা গোটাকয়েক রঙ্চটা মেডেল। বিবর্ণ বে-ঢপ কালো

প্যাণ্টের পিছনে নীলরঙের একটা তালি। কোটরে ঢোকা চোখ দুটো বন-বন করে ঘুরছে।

হাঁ যাদুকর বটে!

সশ্রদ্ধ চোখগুলো উদগ্র হয়ে উঠেছে।

মন্তর জানে নারে? আঙুল চুষতে চুষতে ছোটভাই বড়ভাইকে জিজ্ঞাসা করল।

ধ্যাৎ বোকা, সব হইল হাত সাফাই—শোনাকথাটা বিজ্ঞের মত ছোট-ভাইকে শুনিয়ে দিল বড়ভাই।

খেলা সুরু হল।

আপনাগো মধ্যে যে কেউ আমার হাতের থিকা একটা তাস ন্যান।

হাতের মধ্যে উল্টো করে এক প্যাকেট তাস মেলে ধরে বলল মনতোষ।

ন্যান, ন্যান ভয়ডা কি। হ, ভাল কইরা দেইখ্যা রাখেন, পাশের মাইনষেরও দেখান। হইছে? ব্যাস, এইবার ন্যান দেখি এই তাসের মইধ্যে আপনারডা ঢুকাইয়া। বেশ ভাল কইরা বাইটা ন্যান এইবার।

তাসগুলো ফিরিয়ে নিয়ে হাতের যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে বিড়বিড় করে কি জানি সব মন্ত্র পড়ল। তারপর নির্ভুল তাসটা বের করে বিজয়ীর মত জিজ্ঞাসা করল:

ক্যামন, এইটা, আপনার তাসতো? ছাখেন ছাখেন ভাল কইরা ছাখেন। কমু ক্যামতে আমারওতো ভুল হইতে পারে। শাস্ত্রে আছে মুনির ও মতিভ্রম হয়।

বড়ভাইও ইতিমধ্যে আঙুল পুরে দিয়েছে মুখে। গ্রাম্য বৌটি স্বামীর গা ঘেঁসে বসেছে আর একটু। ভীরু চোখ দুটো বিস্ময়ে গোল হয়ে উঠেছে।

তারপর টাকা জল করা হল। পয়সা বৃষ্টি হল শূন্য থেকে। এইবার আসল খেলা।

ডুগডুগি—ডুগ ডুগ! ভানমতির খেল।

আবছা অন্ধকারে রহস্যময় হয়ে উঠেছে তাঁবুর ভেতরটা।

গুরুদেব এই বিদ্যা দিছিলেন মাত্র দুই জনরে—তার মইধ্যে গণপতি গত হইছেন।—দ্রৌপদীর থালের বেত্তান্ত শোনেন নাই—যতই খাও থালের ভাত কিছুতেই ফুরাইত না। এই বাটিটাও সেই রকম, ঢাকা দিলেই খালি বাটিতে চাউল আইয়া পড়ে। কিষ্টঠাকুর এই মন্ত্রই শিখাইছিলেন দ্রৈপদীরে। ক্যামন, এই বাটি দুইটা খালিতো?

একটা খালি চীনে মাটির বাটির উপর আর একটা দিয়ে ঢাকা দিতে দিতে বলল মনতোষ হালদার। যাদুদণ্ড ছুইয়ে মন্ত্র পড়লো। তারপর ঢাকা খুলতেই দেখা গেল একবাটি চাল।

দর্শকেরা স্তব্ধ, বিস্মিত।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের মেয়েটা তার স্বামীকে বলল:

মন্তরের জোর আছে কিন্তুক—অগো আবার চাউলের অভাব কি!

মনতোষের বৌ বাতাসী কিন্তু বলে:

মন্তর না ছাই! মন্তর জানেতো চাউল বাইর করুক না দেখি—মেলায় মেলায় ঘোরণের কি কাম—পয়সা দিয়া চাউলই বা কেনে ক্যান?

সবর্বদা ব্যাভার করলে মন্তরের জোর থাকে নাকি! বুঝ দেবার চেষ্টা করে মনতোষ।

খেলা দেখাইবো না? আরে খেলা না দেখাইলে চেন্‌ব কে প্রেফেছার মনতোষ হালদাররে। নাম—নামডাই তো আসল।

বাতাসীর মায়ের পেটের ভাই গনেশের ভক্তিটা আবার বেশি। মনতোষকে ভজিয়ে যদি কয়েকটা খেলা শিখে নেওয়া যায়। বিচিত্র পোশাক পরে সাকরেদী করে বেড়ায় মনতোষের। বেখাপ্পা তাঁবুটার সামনে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে।

নামডাই আসল—নিস্তারিণীরও তাই মত। বাপ পিতাম' সকলেই তো হাল চষেছে—ধানও তুলেছে গোলা ভরে। শ্বশুর ভাসুরের প্রতি অশ্রদ্ধা করতে নেই। কিন্তু গেরামের লোক ছাড়া কেউ কি চেন্‌থ তেনারগো?

প্রথম যেবার রাণীডাঙার মেলা থেকে খেলা দেখিয়ে নগদ পাঁচ টাকা এনে দিয়েছিল মনতোষ সেইবার নিস্তারিণী গোঁ ধরে বসলো:

বিয়া দেও পোলার এইবার

ও হারামজাদার বিয়া দিয়া কি হইব। এতখানি বয়স হইল হাল দিতে শেখল না এখনও—পরের বাড়ির ঝি আইন্যা কষ্ট দেওনের কি কাম? ' বারব্যার আপত্তি করেছিল প্রাণকৃষ্ণ।

কিন্তু কোন কথায় কান দেয়নি নিস্তারিণী।

হাউলা চাষা না হইলে মাইনষেরে তোমরা তো মানুষ কইরাই গ্যান করতে চাও না—ত্মাশ বিশ্বাশের লোক মন্তার কত প্রশংসা করে, তোমারে চেনে কেডা?

সুতরাং চুপ করে যেতে হয়েছিল প্রাণকৃষ্ণকে।

বিয়ের রাতে অল্প বয়সী মেয়েটাকে একেবারে ভড়কে দিয়েছিল মনতোষ।

দেখি দেখি তোমার কানেব মধ্যে ওডা কি—

বিভ্রান্ত বিহ্বল চোখে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা। চট্ করে ওর কানের মধ্যে হাত দিয়ে আস্ত একটি রূপোর টাকা বের করে এনেছিল মনোতোষ।

কানের মইধ্যে টাকা ছিল একটা

তারপর মেয়েটার বিস্ময়ে জ্বলজ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় মায়া হয়েছিল। তাই বিজয়ীর মত বুক ফুলিয়ে বলেছিল:

বোঝ্লা না, এয়া হইল ম্যাজিক

পরে কিন্তু বিরক্ত হত বাতাসী:

রঙ্ তামসা ভালো লাগে না সব সময়—কামেব কাম নাই অকামের গোসাই! বলি লাঙ্গল দেওনের ব্যবস্থা করলা না যে—ধান পাইবা কই?

তরগো আবার ধানেব অভাব! গণেশ বলে, দাদার ভানুমতির খেল যতক্ষণ আছে—ভাবনাডা কি

বাঁকা ধারালো একটা বাহাদুরীর হাসি ফুটিয়ে তোলে মনতোষ। বাদুকর মনতোষ হালদার কি একটা কেউকেটা!

তিন দিন পরে মেলা ভাঙে। একটা অতিকায় জানোয়ারের নোংরা পিঠের মত এবড়ো খেবড়ো হয়ে ছড়িয়ে থাকে রাণীডাঙার মাঠ। ইতস্তত পড়ে থাকে ভাঙা বাঁশ আর দড়ির টুকরো—মেলার ধ্বংসাবশেষ। ব্যবসা পত্তর গুটিয়ে ফিরে যায় সবাই; হিসাব করে আর মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে।

বেচাকেনা ভালই হয়েছে। চাষীর হাতে পয়সা ছিল এবার। ধান উঠতে না উঠতে বড় বড় নাও নিয়ে কতগুলি মানুষ এসে হাজির হয়েছিল। দেড়গুণ, দু'গুণ দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেছে সব ধান। হাত ভরে পয়সা পেয়েছে সবাই। মনের আনন্দে সওদা করেছে মেলা থেকে।

অনেক সন এমন বেচাকেনা হয় নি—খুশি দেখায় সকলকে।

কত হইলরে গণশা—কত দেখলি গইন্যা?

দুই কুড়ি দশ টাকা

ঘরের চালটা এইবার ছাইয়া লওন যাইব—কি কস?

হ তাতো যাইবই—কয় আঁটি বা খড়ের দরকার!

আগে কই নাই তরে—পকেটে হাত দিল মনতোষ। তারপর রহস্যময় ভাবে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ—যেন নতুন কোন ম্যাজিক দেখাচ্ছে। অবশেষে পকেট থেকে একজোড়া কাচের চুঁড়ি বের করে বলল: তর দিদির জইন্য কিনছিলাম, ছাখতো ক্যামন হইল, পছন্দ হইব তো?

সুন্দর, পছন্দ না হইলেই হইল—মিইয়ে যাওয়া স্বরে সায় দিল গণেশ। সামান্য একজোড়া কাঁচের চুড়ি তাই নিয়ে এত লুকোচুরি!

কিন্তু হাওয়ায় মিলিয়ে গেল স্বপ্নের বুদ্‌বুদ। দেবতা ভ্রূকুটি করলেন। দোলায় গমন করেছেন দেবী—ফল দুর্ভিক্ষ। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হবার নয়। নইলে ধান তো আর কম হয়নি এবার।

চাল চাল করে ঘুরে এসে অসহায় জটলা করে মানুষগুলো:

ইস, কি মাটি খাইছি—বেশি টাকার লোভে বেইচা দিলাম ধানগুলান

মাটি বইলা মাটি! কিন্তু একটা উপায় তো বাইর করতে হয়—

উপায়? একটা অনিশ্চিত আতঙ্কের ধোয়াটে শীতল অনুভূতি পাক খেয়ে ওঠে।

কোন এক পাগলা যাদুকর তার হাতের যাদুদণ্ডটা ঘুরিয়ে নিয়েছে ধানের গোলাগুলির উপর। শূন্য গোলা ছুঁচো ইঁদুরের লীলাক্ষেত্র।

নৈঋৎ কোণে দুটো শকুন পাক খেয়ে গেল। দেবতা রুষ্ট হয়েছেন। মড়ক।

চাউল ফুরাইয়া গেছে—একদিন সকালে শেষ কথা জানিয়ে দিল বাতাসী।

অনেক ঘুরে পচিশ টাকা দিয়ে একমণ চাল কিনে এনেছিল মনতোষ। কিন্তু একমণ চালে তো আর সারা বছর চলতে পারে না।

ফুরাইয়া গেছে—আর্তনাদের মত শোনায় মনতোষের কথা। তইলেত' চাউলের চেষ্টায় বাইর হওন লাগে—কি কসরে গণশা?

হ, বাইর হওন লাগে—অনিশ্চিত ভাবে সায় দেয় গণেশ।

তারপর এলোপাথাড়ি খানিক্ষণ ঘুরে এসে গুম হয়ে বসে থাকে। উনুনের আগুন নিভিয়ে দিয়ে গাল পাড়ে বাতাসী: ম্যাজিক করে, ম্যাজিক—কামের কাম নাই অকামের গোসাঁই। বউ পোলারে খাওয়াইতে পারে না—গলায় দড়ি অমন মাইনষের! মন্তর না ছাই—

সব্বদা ব্যাভার করলে মন্তরের জোর থাকে নাকি—পুরান কথায় বুঝ দেবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করে মনতোষ।

হইছে, অত ভুনতির (ভনিতা) কাম কি! মন্তর ধুইয়া জল খাইব মাইনষে—

অবশেষে যেন একটা তৃণখণ্ড পাওয়া গেল। শ্মশানের বটতলায় এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছে। রসিক মাতব্বর আসছিল ও পথ দিয়ে।

আগেও নয় পরেও নয়—ঠিক এমন সময়টাতেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের নিশ্চয়ই একটা গূঢ় তাৎপর্য আছে।

রসিক মাতব্বর গিয়ে পা জড়িয়ে ধরেছিল সন্ন্যাসীর : একটা উপায় দেন বাবা—উপায় দেন। ভগমানই আপনারে প্রেরণ করছেন। তেরাণ করেন—

সমস্ত গ্রামের আর্ত আকুতি যেন ঝড়ে পড়েছিল রসিকের কণ্ঠে।

কোন কথা বলেন নি সন্ন্যাসী। বাঁ হাত একমুঠি ধূলা কুড়িয়ে নিয়ে, মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে রসিকের দিকে প্রসারিত করে বলেছিলেন—ধর।

চক্ষু মুদে ভক্তিভরে গামছা মেলে ধরেছিল রসিক। চোখ খুলে দেখা গেল কোথায় ধূলো, গামছার ওপর ছড়িয়ে আছে একমুষ্ঠি কণা। দেবতার আশীর্বাদ!—চাউল পাইমুতো আমরা, সেই কথাটা কইয়া দেন ঠাকুর!

হাতের ইসারায় আর একদিন আসতে বলে দিয়েছেন সন্ন্যাসী।

কথাটা ছড়িয়ে গেল মুখে মুখে।

হ, মন্তরের জোর বটে! মুহূর্তেকের মইধ্যে ধূলামুষ্ঠি কিনা হইয়া গেল কণা!

মন্তর না ছাই—কেন জানি চটে ওঠে মনতোষ, ওয়া আমিও পারি। ধূলারে চাউল বানাক দেখি তয় না বুঝি—

খুব মাতব্বর হইয়া পড়ছস তুই মন্তা—ফেটে পড়ে রসিক মাতব্বর। অত গোমর ভাল না, ধরারে সরা জ্ঞান—নরকেও স্থান হইব না তর ছেমড়া—

কেমন জানি একটা গো চেপে বসে। সোজা একদিন বটতলা গিয়ে হাজির হল মনতোষ :

ভারী মন্তর শিখছ—ধূলারে চাউল কর দেখি তয় বুঝি—

প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে একটুও বিচলিত দেখায় না সন্ন্যাসীকে। স্মিত হাস্যে হাতের ইসারায় বসতে বলেন—বৈঠ বেটা। কেমন একটা অপার্থিব ভাব, যন্ত্রচালিতের মত বসে পড়ে মনতোষ। তারপর একমুঠো ধূলা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন—ধর।

নিতান্ত অবজ্ঞা ভরে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল মনতোষ। ওর প্রসারিত হাতের ওপর একমুঠো চাল ঝকমক করে ওঠে।

মন্তর না ছাই—অন্যদিকে চাইছিলাম এই ফাঁকে কাম সারছে—

নিজের কৈফিয়ৎটা নিজেরই কেমন বেসুরো লাগে। কিন্তু শুধু মন্তরটা তো কোনদিন পরীক্ষা করে দেখেনি মনতোষ!

ধুলো যদি ফুল হতে পারে তবে চাল হতে বাধা কি!

বাধা যে কিছু নেই তার প্রমাণও পাওয়া গেল। রসিক মাতব্বর আর একদিন গিয়ে দু'মুঠো চাল নিয়ে এসেছে।

ধুলিমুষ্ঠি কিনা মুহূর্তেকের মধ্যে হইয়া গেল চাউল। কও—এয়ারে মন্তরের জোর কইবা কি না!

জোরগলায় বলে রেডাল মাতব্বর।

মানুষগুলো যেন ভরসা পেল। ভগবানের লীলা বোঝে কার সাধ্য। দুর্ভিক্ষ দিলেন আবার ত্রাণকর্তাও পাঠালেন তিনিই।

হারাণ গিয়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল সন্ন্যাসীর, গিয়েছিল নিতাই পাল, শীতল হাজরা—নিরাশ হতে হয়নি কাউকেই। পো-টাক চাল নিয়ে এসেছে সকলেই। খুশি মনে একটাকা করে দক্ষিণা দিয়ে এসেছে ওরা। সে টাকা ছোঁয়নি সন্ন্যাসী।

কও এয়ারে মন্তরের জোর কইবা কিনা!

মন্তর না ছাই বুজরুকী! কিন্তু জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারেনি মনতোষ।

কেমন যেন একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। জোরে একটা নিশ্বাস টেনে নিল মনতোষ। আঃ

কারা জানি ভাত রান্ত্যাছে—গণেশ বলে।

তাই বটে ভাতেরই গন্ধ! নিশ্চয়ই পরাণের বাড়ি!

রান্বো না! সকলে তো আর ম্যাজিক কইরা বেড়ায় না—বউ পোলারে খওয়াইতে পারে না গলায় দড়ি, গলায় দড়ি অমন মাইনষের—অদ্ভুত একটা বিকৃত ভঙ্গী করে বাতাসী।

পরাইন্যা ও পরাইন্যা—চাউল পাইলি কই রে? হরি সা কি দিতাছে নাকি? ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে মনতোষ।

সন্ন্যাসী বাবার কাছ থিকা আনছি! যাই কস্ বাবার মন্তরের জোর আছে কিন্তুক।

কেমন জানি নিভে গিয়েছিল মনতোষ। মন্তর? হবেও বা শুধু মন্তর দিয়ে তো কোন দিন পরীক্ষা করে দেখা হয় নি!

চুড়ি গাছ দে দেখি।

ছাই মন্তর জানে—বাইর করুক না চাউল, হয় গান বুঝি—জ্বলে উঠেছিল বাতাসী। তবু খুলে দিয়েছিল শেষ চুড়িগাছা। গণেশ সেটা নিয়ে গেছে হরি সা'র দোকানে। যদি কিছু চাল পাওয়া যায়।

মন্তর! অবসন্ন ভাবে রোদের মধ্যে বসে থাকে যাদুকর মনতোষ হালদার।

এদিকে ওদিকে খানিকক্ষণ ঘুরে ফিরে আসে গণেশ—চাউল দিলনা হরি সা. দাম চড়াইয়া দিছে আরও।

কোন কথা যেন কানে যায় না মনতোষের। একটা জ্বালাময় অনুভূতি পেটের ভিতর থেকে উপর দিকে উঠতে থাকে—মাথাটা ঝিম ঝিম করে!

চাবিটা দেও দেখিছে—

তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে মনতোষ।

চাবি দিয়া কি হইব? কত যেন ধনসম্পদ রাখছে বাক্সে—ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বাতাসী। আঁচলের গিট খুলে সশব্দে ছুঁড়ে ফেলে দেয় চাবির রিঙ্।

আয় দেখি গণশা—

বোকার মত পিছন পিছন গেল গণশা। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে মনতোষকে।

প্যাটরা খুলে বার করল সেই বড় জলে যাওয়া কালো কোট আর প্যাণ্ট, হাড়ের যাদুদণ্ড আর সেই দ্রোপদীর বাটি।

প্রফেসার মনতোষ হালদারের ভানুমতির খেল—

জানালার ঝাপটা টেনে দেওয়ায় ঘরের মধ্যে একটা আবছা অন্ধকার।

ও, চাউল বাইর করবেন, বুঝছি! তাইলে আইজ ভাত খামু—বোকার মত হাসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল গণেশ। কোট প্যাণ্ট পরিহিত যাদুকরের চোখ দুটো বন বন করে ঘুরছে। গা-টা হঠাৎ ছম ছম করে ওঠে গণেশের।

উঁচু একটা টুলের ওপর ঢাকা দিয়ে রাখা হল বাটিটা।

বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে হাতের যাদুদণ্ডটা ঘুরিয়ে নিল বাটির ওপর দিয়ে—একবার, দু'বার, তিনবার!

লাগ্ লাগ্ ভানুমতির খেল!

ঝুর ঝুর ঝুর শব্দ হচ্ছে বাটিটার মধ্যে! আসছে, চাল আসছে—প্রতিটি ইন্দ্রিয় উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে মনতোষ হালদারের। শব্দ হচ্ছে—আসছে চাল। শূন্য বাটি পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সারা শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে যাদুকরের।

শব্দ শোনছস? আইচ্ছা এইবার খোল বাটির ঢাকা।

মোহগ্রস্তের মত বাটির ঢাকা খুলল গনেশ।

কই কিছু নাই তো বাটিতে—

নাই—একটা আর্ত আর্তনাদে ভেঙে পড়ে মনতোষ। তবে যে কইছিল জোর আছে মন্ত্রের···

অতলান্তিক নরক থেকে যেন ভেসে এলো প্রফেসার মনতোষ হালদারের কণ্ঠস্বর।

গাছ বোকা ছেলেটা। নইলে বসে থাকে কেউ এই বাজারে! পাড়ার পঞ্চানন অবধি চাক্‌রী পেয়ে গেল—বিরাশী টাকা মাইনে। মন্দ কি! ঠেলে ঠুলে ম্যাট্রিক ক্লাস অবধি উঠেছিল। পরেশ তবু নির্বিকার। চাক্‌রী না করিস দাদাকে সাহায্যও তো করতে পারিস; তাও না। স্বদেশী কি আর লোক করে না বাপু! কানে তুলো দিয়ে পিঠে কুলো বেঁধে বসে আছে পরেশ। বোকা না হাতী, ধুঁদে সয়তান ছেলেটা। বসে খাবার মতলব আর কি!

ছেলের মত ছেলে যদি কেউ থাকে তো সে হচ্ছে রমেশ। কে বলবে পরেশেরই দাদা ও। আই-এ, বি-এ পাশ না হয় করেনি, কি আসে যায় তাতে। দশজনের একজন রমেশ। এই তো সেদিন কুইনিনের ওপর দাও মেরে নগদ একশ' টাকা ঘরে এনেছে। বি-এ পাশ করে এম-এর দোর অবধি তো ঘুরে এলো—কই আনুক না দেখি দশটা টাকা, বুঝি। যে গরু দুধ দেয় না, তার আবার চাট্। বলে আবার ধরিয়ে দেবে রমেশকে, সুবিধে পেলেই। কুইনিন নিয়ে ছিনিমিনি খেললে গরীবলোক সব মরে যাবে যে! ওরে আমার রামকেষ্টরে! চালাকী বুঝতে বাকি নেই বিনোদিনীর।

এতকাল কোন কথা বলেনি বিনু বৌদি। ইদানিং মুখ খুলেছে। এখন আর কার তোয়াক্কা করে সে! স্বামী তার রীতিমতো রোজগেরে। চ্যাটাং চ্যাটাং করে দেয় দু'কথা শুনিয়ে।

পরেশ কিন্তু নির্বিকার। বাড়ি আসে, খায় দায়, একটু বিশ্রাম করে কি করে না, আবার বেরিয়ে পড়ে বনের মোষ তাড়াতে। মা বলেন:

তুই কি চিরকালই বসে থাকবি তবে কি জন্য লেখা পড়া শেখান হোল তোকে?

তাহ'লে টাকার জন্যই লেখা পড়া শিখিয়েছিলে' বলো, বলে দাও—কাল থেকে আব আসব না।

'আব পারি না তোর সঙ্গে। কি যে কথাবার্তাব ছিরি!

আপাতত চুপ কবে যান মা। আবার কোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রস্তাবটি নিয়ে আক্রমণ করবেন।

আব মালতী, পবেশেব ছোট বোন। মালতীব জন্যই যত ভাবনা পরেশেব। কোনদিন দেবে একটা বাটেব মডাব সঙ্গে ঝুলিয়ে বেচাবীকে, তাবি ষডযন্ত্র চলছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি গাধাব মত খাটায় মেযেটাকে। দুপুবে একটু অবকাশ। পবেশেব ঘবে এসে হাজির হয় মালতী।

নিচেব ঘবটায় ড্যাম্প, দিনেব বেলায আলো জ্বালতে পাবলেই যেন ভাল হয়। তবু এইটেই পছন্দ পবেশেব, একটু নিরিবিলি।

কি একটা বইয়ে ডুবে ছিলো পরেশ। পায়েব শব্দ মুখ তুললো।

আয় মালতী

ছেলে মানুষ আছে মালতী এখনও। পবেশেব বই কাগজপত্র নাডানাডি করা ওর চাই। পরেশ শুধু একবার সাবধান কবে দেয়: দেখিস্ হাবাসনে যেন কিছু।

নাগো না। একি দাদা, তোমার জামাটা যে একেবাবে ছিঁডে গেছে, হঠাৎ চোখ পড়ে মালতীর, একটু সেলাই কবে দি। ছুঁচ সুতো আনতে পা বাড়ায় মালতী।

আব সেলাই কবতে হবে না ডেঁপো মেয়ে—আব একটা জামা আছে আমার। সাবাদিন খেটে খুঁটে দুপুর বেলা আবার এলেন উনি সেলাই করতে।

ফিরল মালতী।

বড্ড খাটুনী গিয়েছে নাবে তোর? এই খানটায় একটু শুয়ে নে তুই। সস্নেহ কণ্ঠ পরেশের।

সজল হয়ে আসে মালতীর চোখ। লক্ষ্মী মেয়ের মত শুয়ে পড়ল সে। মালতীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে পরেশ বল্‌লো—ইস্‌ তোর গায়ে কি ঘামাচি হয়েছে।

মা দিনের পর দিন হিংস্র হয়ে উঠছেন। ছোড্‌দা অন্তপ্রাণ মালতীর। তাই মালতীর ওপরই গিয়ে পড়ে রাগটা।

মর, মর, মরণ হয় না তোর! দিন দিন ধিঙ্গি হয়ে উঠ্‌ছিস্‌—আড্ডা দিলেই চল্‌বে?

ম্লান মুখে উঠে যায় মালতী, জবাব দেয় না। স্তব্ধভাবে বসে থাকে পরেশ।

নির্বিরোধ ভালো মানুষ ব্রজেনবাবু। কারুর সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না তিনি। তিরিশ টাকা মাইনেয় মার্চেন্ট অফিসে ঢুকেছিলেন—ছাব্বিশ বছরে বেড়ে পঁচাত্তর টাকায় এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেছে। পঁচাত্তর টাকা মরুভূমিতে জলবিন্দু, সংসার চলে না। রমেশের ওপর কথা বল্‌বেন কোন্‌ সাহসে? মাসান্তে বিনোদিনীর হাতেই তুলে দেন্‌ টাকাটা।

একি দু'টো টাকা কম কেন? ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করে বিনোদিনী। গলার স্বরে পুঞ্জীভূত বিরক্তি।

পরেশ একটা টাকা নিয়ে নিল, আর মালতী ক'টা জিনিস আনতে বলেছিল তাই···আম্‌তা আম্‌তা করেন ব্রজেনবাবু।

তা আমি আগেই বুঝেছি। আপনিইতো মাথাগুলো চিবিয়ে খেয়েছেন ওদের। অথচ ওর টাকাগুলো অবধি এ চুলোর পিণ্ডি যোগাতেই যায়, একটা পয়সা পর্যন্ত জমাতে পারলো না। গর্জে উঠ্‌লো বিনোদিনী।

মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে হজম করেন তিরস্কার। বিনোদিনীর কথা অবশ্য সত্য নয়—ব্রজেনবাবু তা জানেন। রমেশের ব্যাঙ্কের হিসাব তার হাতে পড়েছিল একদিন।

কয়লা নেই। এই নিন টাকা—কাল সকালেই উনুন ধরবে না।

দু'টাকার একটা নোট ব্রজেন বাবুকে দিয়ে বাকী টাকাটা আঁচলে বাধলো বিনোদিনী! ব্রজেনবাবু বস্তা নিয়ে অফিসের কাপড়েই বেরুলেন কয়লার জোগাড়ে।

পা টিপে টিপে বিনোদিনী এসে ঢুকল পরেশের ঘরে। কিছু আগে বেরিয়ে গেছে পরেশ। এ সময় কোনদিনই থাকে না সে।

মালতী সস্তা দামের সাবান পাউডার নেড়েচেড়ে দেখছে। বাঃ বেশ গন্ধটা। বড্ড ঘামাচি হয়েছে তার। ছোঁ মেরে সাবান পাউডার তুলে নিল বিনোদিনী।

আদিখ্যেতা। সাবান মাখে—বাপ ওর রোজগেরে লাট্। জানালা খুলে কি হচ্ছিল শান এই ভর সন্ধ্যেবেলা—পিরীত জমাচ্ছিলি বুঝি ওই ছোকরার সঙ্গে।

বৌদি! আর বল্‌তে পারে না মালতী। আবছা অন্ধকারে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ে ওর চোখ থেকে। ঘামাচিগুলো চুট্ মুট্ করে ওঠে—ঘস ঘস্ করে চুল্‌কোতে থাকে মালতী।

•

ব্রজেনবাবু আধমনি বস্তার ভারে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসেছেন অনেকক্ষণ। পরেশ শুয়ে শুয়ে একটা সাপ্তাহিকের পাতা উল্‌টোচ্ছে। মচ্ মচ্ করে জুতোর আওয়াজ হলো—রমেশ এলো।

বিনোদিনী চোখ বুজে পড়ে ছিল। আলো জ্বালতে পাশ ফিরে শুলো। নিচ থেকে একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরেই এসেছে রমেশ। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। তারপর নিজের দিকে আকর্ষণ করলো বিনোদিনীকে।

জেগে আছো?

হুঁ—বলে সুকৌশলে নিজেকে মুক্ত করে নিলো বিনোদিনী। ও বাড়ির

বৌ কি চমৎকার একটা কানপাশা গড়িয়েছে। একটা অপরূপ দেহভঙ্গী করে বল্লো বিনোদিনী।

সন্তান হয়নি এখনো বিনোদিনীর। অনুনবা এ রমণীর আকর্ষণ কম নয়। কানপাশার প্রতিশ্রুতি দিতে হলো রমেশকে।

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে মালতী।

মিলিটারী কনট্রাক্টটা কি ফসকে যাবে নাকি? হঠাৎ অসময়ে বাড়ি ফিরে এলো রমেশ। পরেশ তো অবাক। বিনোদিনীর সঙ্গে তার কি কথা হলো কে জানে। রমেশ ডাকলো—মালতী

কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় সচকিত মালতী দুরু দুরু বক্ষে এসে দাঁড়ালো রমেশের সামনে।

কথা কিন্তু বললো বিনোদিনী—দাদার তোমার সখ হয়েছে বোনকে নিয়ে সিনেমায় যাবে। নাও চট্ করে গা ধুয়ে নাও। কাল্কের সেই সস্তাদামের সাবানটা এগিয়ে দিল বিনোদিনী।

আজ্ঞা পালন করা অভ্যাস হয়ে গেছে মালতীর। কলতলায় এসে গা উদ্লা করে সাবান মাখ্তে মাখতে খানিকটা কেঁদে নিলো মালতী। কেমন যেন সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।

পরেশ বেরিয়ে যাচ্ছিল। কলতলা থেকে বেরোতেই মুখোমুখি পড়ে গেল মালতী।

কি বল্লো রে দাদা?

সিনেমায় নিয়ে যাবে বল্ছে।

খবরদার যাসনে। নিশ্চয়ই কোন বদ্ মতলব আছে।

কেন যাবে না শুনি। মা কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি পরেশ।

বলি নিজের তো কোন মুরোদ নেই, অন্যে নিয়ে যেতে চাইলেইও বাদ সাধ্‌বি! কি শত্তুরই ধরেছিলাম পেটেরে বাবা....

পরেশ ততক্ষণ রাস্তায়।

বিনোদিনীর দামী শাড়ি পরে, স্নো পাউডারে সুরভিত হয়ে রমেশের সঙ্গে মালতী সিনেমায় গেল।

ফিরল সেই সাড়ে ন'টার সময় ট্যাক্সি করে। অধৈর্য হয়ে পড়ছিল পরেশ। মোটরের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দিল। নির্জীবের মত নামলো মালতী। এ যেন মালতী নয় আর কেউ। চম্‌কে উঠ্‌লো পরেশ।

কি হয়েছে রে তোর?

রমেশ ততক্ষণ মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে উপরে উঠে গেছে।

কিছু না, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলো মালতী।

মালতীর গলাটা কি একটু কেঁপে উঠেছিল? পরেশেরই শোনবার ভুল হয়ত!

আজ আর কিছু খাসনে, শুয়ে পড়্‌গে যা

মালতী বোধ হয় সত্যকথা বললো না। কিন্তু ব্যপারটা কি? সংসারটা কি রকম জটিল অরণ্যের মতো মনে হোল পরেশের।

•

রাত্তিরে কি কেউ ঢুকেছিল তার ঘরে? সকালে উঠে পরেশের আবছা মনে এলো—রাত্তিরে কে যেন ঢুকেছিল। কিন্তু কেন? দূর হোক গে ছাই, বোধ হয় স্বপ্ন। উঠে পড়ল পরেশ। আরে এ চিঠি এলো কোত্থেকে তার বিছানার ওপর? কুড়িয়ে নিল পরেশ, মালতীর লেখা। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল চিঠিখানা। রমেশ কাল রাত্রে মালতীকে মোটে সিনেমাতেই নিয়ে যায় নি।

বিবর্ণ মুখে পরেশ আবার পড়ল চিঠিখানা। মালতী লিখেছে:

এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না ছোড়'দা। মরতে তো আমি

চাইনি—যদিও আমি লিখে যাব, এ মৃত্যু আমার স্বেচ্ছাকৃত। তুমি পালাও ছোড়দা। ওরা তোমাকেও মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে। সব ভাল লোককেই ওরা মেরে ফেলবে।

মালতী

মালতী নেই। মালতী নেই। চোখ ছাপিয়ে জল এলো পরেশের। বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে আত্মগত ভাবে সে শুধু বললো—এ তুই কি করলি মালতী—এ তুই কি করলি! পরেশ ইচ্ছে করলেই তো বাচাতে পারতো মালতীকে। তখন যদি সে ভাল করে জেগে উঠতো। এতো জলের দাগ—রোদেই শুকিয়ে যেত। এ তুই কি করলি।

পরেশের প্রয়োজন ফুরিয়েছে এ বাড়িতে। বাড়ির অপদার্থ ছেলেটা তার সামান্য বই কটা সুটকেশে পুরে বেরিয়ে পড়ল সবার অলক্ষ্যে। বাড়িতে তখন হট্টগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। মা-র চিৎকার শুনতে পাচ্ছে পরেশ। একবার দেখে যাবে নাকি মালতীকে। না পরেশ তা পারবে না। হয়ত গলায় দড়ি দিয়েছে মালতী। চোখ দুটো হয়ত ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে মুখটা, জিবটা হয়ত বেরিয়ে এসেছে, শেষ মুহূর্তে হয়ত বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ওর সমস্ত শরীর হয়ত বেঁকে গেছে সে চেষ্টায়। গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে সব। না, মালতীর এমূর্তি সে দেখতে পারবে না।

শিউরে উঠলো পরেশ।

ব্রজেনবাবু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন—অফিসে যাওয়া আজ আর হবে না। রমেশকে বেরুতেই হলো, আজ তার কনট্রাক্ট পাকা হবে।

মুহূর্ত

ধড়ফড় করে উঠে বসলো মলিনা। কি ঘুমেই যে তাকে পেয়েছিল! নীলচে ম্লান আলোয় সমস্ত ঘরটা ভরে গিয়েছে। কত বেলা হল কে জানে! মা উঠে পড়েছেন হয়তো। গরমে আর ছারপোকার কামড়ে অনেক রাত অবধি ঘুম হয়নি তার। ঘুমের জড়িমা লেগে রয়েছে এখনও। চোখ রগড়াতে রগড়াতে চারদিকে একবার তাকালো। না, ইন্দুমতী এখনও শুয়েই আছেন যাক্ বাঁচা গেল! একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লো মলিনা। ট্রামের শব্দও ত' শোনা যাচ্ছে না; তা'হলে বেলা বেশি হয়নি এখনও। একটা আড়মোড়া ভাঙলো মলিনা। তারপর বিস্রস্ত বসন ঠিক করতে করতে উঠে পড়ল সে। এখুনি আবার স্নান সেরে নিতে হবে, নইলে কল পাবার আর যো আছে!

একটু বাদেই সমস্ত বাড়িটা জেগে উঠ্‌বে—সুরু হবে একটা কুরুক্ষেত্র। গাতার ঠাকুমা কর্কশ পরুষ কণ্ঠে অনবরত চিৎকার করবেন—নর্দমা ছুঁয়ে দিল, এঁটোকাটা দিয়ে সংসার রসাতলে দিল। ইন্দুমতীই কি কিছু কম যান নাকি! ঐ তো শরীর, দুখানা হাড়। কিন্তু গলার কি অসম্ভব জোর!

গামছাটা কাঁধে ফেলে—চুলে তেল মাখতে মাখতে একতলায় নেমে এলো মলিনা! বাথরুম তো নয়, একটা প্রহসন! ছেঁড়াচট্ দিয়ে কোন রকমে ঘিরে নেওয়া হয়েছে, ওপরটা ত খোলাই। আব্রুরক্ষা হয় না, ঠাট বজায় থাকে মাত্র। কাপড় ভেজান চল্‌বে না, দুখানা মাত্র কাপড় মলিনার। একখানা আবার কলেজে যাবার জন্যে—বাড়িতে ব্যবহার করা চল্‌বেনা। হলুদের ছাপ মাখা কাপড়ে তো আর কলেজে যাওয়া চলে না। সুতরাং বে-আব্রু বাথরুমে গামছাই পরতে হ'লো মলিনাকে। গায়ে জল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে অভ্যাস বশেই তাকাল উপরের দিকে। অবিনাশ বাবুর বয়াটে ছেলেটা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক দাঁতন করছে। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো মলিনা—খাটো গামছাটাকে বুকের

উপর ভালো করে জড়াবার ব্যর্থচেষ্টা করল একবার। মাথা নিচু করে গড় গড় করে দু'ঘটি জল ঢেলে তাড়াতাড়ি স্নান পর্ব শেষ করলো সে। তারপর কোন রকমে কাপড় বদ্‌লে বেরিয়ে এলো মলিনা।

এই যে নবাব পুত্রীর স্নান হ'লো? আর একটু পরেই কলেজে যেও। বাড়ির কাজ করবে কেন?—মা বাঁদীতো আছেই! কি শত্তুরই যে পেটে ধরেছিলাম! সদ্যজাগ্রতা ইন্দুমতী অভ্যর্থনা করলেন মলিনাকে। এই ত সূচনা। কোন উত্তর না দিয়ে সে উঠে এলো উপরে।

সতীশবাবুও উঠে পড়েছেন—দাঁতন করতে করতেই বাজারে যাত্রা করেছেন। ন'টার মধ্যে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পরতে হবে তাকে—নইলে আবার ট্রামে চড়তে পারবেন না।

গামছাটা শুকোতে দিয়ে ঘানিতে জুতে গেল মলিনা। রান্নাঘর, মানে বারান্দা পরিষ্কার করলো; উনুন ধরালো। ততক্ষণে ইন্দুমতীও স্নান সেরে এসেছেন, ভিজে গামছা পরে লক্ষ্মীর পাট নিয়ে বসেছেন। এই কাজটা তিনি প্রত্যেক দিন নিজের হাতেই করেন। যুবতী কুমারী মেয়েদের নাকি ঠাকুর দেবতা ছুঁতে নেই। বেঁচে গেছে মলিনা। না হ'লে এটাও ওর ঘাড়েই পড়তো।

ভালো লাগে না মলিনার, কিছু ভালো লাগে না। উদয়াস্ত পরিশ্রম, তবু এই গঞ্জনা সহ্য হয় না তার। বাবা অবশ্য কিছু বলেন না। কোন ব্যাপারে কিছু না বলাই তাঁর স্বভাব। তবে মাসে মাসে কলেজের মাইনে সতীশ বাবু ঠিকই দিয়ে দেন। শত অভাব সত্ত্বেও এ সম্পর্কে তার মুখে কোন অভিযোগ কোনদিন শোনেনি মলিনা! বাবা যদি ওর পক্ষ সমর্থন করতেন…! তাড়াতাড়ি করে মলিনা। এ পাটটা শেষ করতে পারলে বইগুলো একটু উল্টে নেবে। কদিন তো আর ওকর্ম করা হয়নি। এমনি চললে যে কি করে পাশ করবে সে! উনুনের আগুন এতক্ষণে গন্‌গনে হয়ে উঠেছে—ভাত চড়িয়ে দিল মলিনা। ইন্দুমতীই নামিয়ে নেবেন। সুতরাং এবার তার অবকাশ।

কি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন! এতবড় মেয়েকে দিয়ে যদি কোন একটা উপকার হয়। পই পই করে বারণ করেছিলাম দিও না কলেজে। কে শোনে আমার কথা! দেখবো কোন লাট্‌সাহেবের বাড়িতে বিয়ে হয়। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন ইন্দুমতী। চোখ ফেটে জল আসে মলিনার—কোন রকমে দাঁতে দাঁত চেপে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করে সে। চোখে জল দেখলে কি আর আস্ত রাখবেন ইন্দুমতী! অন্যদিন হলে মলিনা আবার রান্না ঘরেই ফিরে যেত। আজ সে চলেই এলো। বই নিয়ে বসলো ঘরে এসে। পাশ তাকে করতেই হবে! সে তো জানে কত কষ্ট করে বাবা মাসে মাসে মাইনের ছ'টা টাকা গুণে আসছেন।

কিন্তু পড়বে কার সাধ্য! গীতার ঠাকুর মা চীৎকার সুরু করে দিয়েছেন, ছুঁয়ে দিলি ত হতভাগা ছেলে কোথাকার! এই মাত্র স্নান করে বেরিয়েছি—কি নরক, কি নরক! এক রকম দৌড়ে এসে দাঁড়ায় নন্তু, কাচুমাচু মুখ করে মলিনার গা ঘেষে।

কি, কুকর্ম করে এয়েছো তো, দুষ্টু ছেলে! সস্নেহে বলে মলিনা। উত্তরে নন্তু মুখ লুকোয় মলিনার কোলে।

বীরুর ছোট ভাই নন্তু। বীরু ছেলেটিকে বেশ লাগে মলিনার। কত আর বয়স হবে—বি-এ পড়ে। বীরুর মা রাধারাণী আরও ভালো। নন্তুকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছেন তিনি। স্বামীর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের স্বল্প পুঁজিতে সংসার চলে। অভাবের সংসার। তবু মুখে হাসি লেগেই আছে। রাধারাণী সত্যই মা। দু'বছর আগে ইন্দুমতীও তো এ রকম ছিলেন না। দু'টো বছরে কি যে হলো। যুদ্ধ—দুর্ভিক্ষ—সব কি রকম ওলট-পালট হয়ে গেল। ৪২ সালের আগষ্ট মাসে দাদা মারা গেলেন পুলিসের গুলিতে। তারপর অভাব অনটনে কি রকম হয়ে গেলেন ইন্দুমতী। সে দৃশ্য মনে হ'লে এখনও শিউরে ওঠে মলিনা—কত রক্ত! সমস্ত জামাটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল দাদার।

রমেনকে দিয়ে কত আশা করেছিল সবাই। সে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী

ছাত্র। রমেন, মলিনার দাদা রমেন—মলিনা রমেনকে ভুলতে পারে না! কত আশা ছিল রমেনের—এবারে হেস্ত নেস্ত একটা কিছু হবেই। হাসপাতালে অন্তিম শয্যায়ও তার মুখে ফুটে উঠেছিল তৃপ্তির হাসি। কিন্তু কই, কি আর হোল?

মরবে বীরুটাও। রমেনের মতই হয়েছে সে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—সারাদিন টোটো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি যে এত কাজ কে জানে! যেন ওকে না হ'লে দেশ রসাতলে যেত! কোথায় কোন লঙ্গরখানা খোলা হবে—ছুটলো বীরু। কোথায় কোন বস্তি পরিষ্কার করা হবে—বীরু গিয়ে ঠিক জুটবে। ছোক্‌রা মরবে শাগ্‌গীরই।

তবু বেশ ছেলে এই বীরু। যতক্ষণ বাড়ি থাকে সমস্ত বাড়িকে মাতিয়ে রাখে। বাথরুম থেকে বেসুরো গানের আওয়াজ আস্‌ছে। বীরু তা'হলে বেরোয়নি এখনও।···কুণ্ঠা, সংকোচ কিছু যেন নেই ছেলেটার। এই ত সে দিন—মলিনা ফিরছিল কলেজ থেকে। বীরু আর একটা মেয়ে হাত ধরাধরি করে যাচ্ছিল কোথায়। দৃশ্যটা মোটেই ভালো লাগেনি মলিনার। বীরু কিন্তু সহজ ভাবে এসে চেপে ধরেছিল মলিনার হাতখানা:

এই যে মলিনা বাড়ি ফিরচো? তোমার সংগে অনেকদিন কথা বল্‌বো বল্‌বো মনে করছি। কিন্তু আবার কে কি বলে তাই আর বলা হয়ে ওঠে না। চলো হাঁটতে হাঁটতে ক'টা কথা বলে নি।

সম্মতির জন্য অপেক্ষা করে না, বীরু হাটতে আরম্ভ করে। অগত্যা মলিনাকেও যেতে হয় সঙ্গে সঙ্গে।

রমেনদার বোন তুমি, তোমার ত' চুপ করে থাকা সাজে না। কিছু কিছু, মানে যতটা সম্ভব তোমার পক্ষে, আমাদের কাজে সাহায্য করতে হবে। মণিদি তোমার সংগে কলেজে কথা বলবে, কেমন?

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল মলিনা। বীরুর হাতের মধ্যে মলিনার হাত কেঁপে উঠেছিল একবার? বেশ লাগে বীরুকে মলিনার! পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজার শব্দে সম্বিত ফিরে পেলো মলিনা।

দশটা বেজে গেল। আজ ক্লাশ নষ্টই হবে তার। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, যে বাবা কখন খেয়ে অফিসে চলে গেছেন, নন্তু কখন চলে গেছে—কিছু টের পায়নি সে। সামনে খোলা বইটার পাতাগুলো ফরফর করে উড়ছে—এক লাইনও পড়া হয়নি।

মা ভাত বাড়ো। কলেজের বেলা হয়ে গেছে। একতলা থেকেই চীৎকার করতে আরম্ভ করে বীরু। চার-পাঁচটা সিঁড়ি এক একবারে টপ্‌কে ওঠে সে।

মলিনা ও উঠে পড়ে। চাবটি ভাত নাকে মুখে গুজে নেয়। দেরি হয়ে যাচ্ছে তবু··প্রথম ক্লাশটা নষ্ট হবেই। সিঁড়িতে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—বীরুও চলে গেল।···বেরুতে গিয়ে হ্যাচকা টান লেগে থম্‌কে দাড়িয়ে গেল মলিনা। তবে কি সে যা ভেবেছে তাই? না, না, তারই ভুল হয়ত! মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলো মলিনা। কিন্তু ফ্যাঁস করে আওয়াজ হোল যে!···ভাবতে পারে না মলিনা—কাপড়ের দিকে ফিরে তাকাতে সাহস হয় না তার। কলেজে যাওয়া আজ হবে না···কলেজে আর যাওয়া হবে না মলিনার। মলিনা এবার সত্যিই কেঁদে ফেল্‌লো—গাল্ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো উষ্ণ নোন্‌তা জলের ফোঁটা।

আগস্ট, ১৯৪২

পুলিস-ক্যাম্পের মধ্যে অস্থির পদে পায়চারী করেন দারোগা অবনীমোহন। ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তার। কতগুলি বিসর্পিল কুটিল রেখায় নিষ্ঠুর মুখটা বীভৎস দেখায়।

ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত নবিত্রার মত শান্ত দেখায় এলাকাটা। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে ধ্বংসস্তূপ—পুড়ে-যাওয়া ঘর-বাড়ির রিক্ত কাঠামো, ঝলসে যাওয়া বাদামী গাছ। বিস্তীর্ণ রিক্ত ধানক্ষেত ধূ-ধূ করে। আল বেয়ে মানুষের পায়ে চলার পথ সাদা হয়ে তকতক করে। একটা বোবা নিঃসঙ্গতায় থমকে থাকে গ্রাম-প্রান্তর।

একটা নেড়া কুকুর এসেছে কোথা থেকে আর চিৎকার করছে অকারণ। একটা কিছু করা দরকার। কেস থেকে হঠাৎ রিভলবারটা টেনে বার করেন অবনীমোহন। আর অবনীমোহনের লক্ষ্য অব্যর্থ তাই কুকুরটা আর শব্দ করবে না কোন দিন।

অপদার্থের দল। দাঁতে দাঁত চেপে হঠাৎ বলে ওঠেন অবনীমোহন। বন্দুক কেড়ে রেখে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বিদেয় করে দিতে হয় সবগুলিকে।

কিন্তু ওদেরই বা কি দোষ! কখন কোথা দিয়ে আক্রমণ আসবে অবনীমোহনই কি তা কল্পনা করতে পারেন? রাত্রির অন্ধকারে কখন্ ক্যাম্পে আগুন ধরে উঠবে, কখন্ কোথা দিয়ে একটা বিষাক্ত তীর এসে লুটিয়ে দেবে একজন বন্দুকধারী সিপাইকে—কার সাধ্য তা আগে থেকে বলতে পারে? আক্রমণের পর অবশ্য বে-পরোয়া গুলি ছোড়া হয় চারিদিকে। কিন্তু গুলি লাগল কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল—তাই কি বোঝবার উপায় আছে? মৃতদেহগুলি কোথায় লুকিয়ে ফেলে, কোথায় কোন্ ঝোপের মধ্যে পুঁতে রাখে—কে তার সন্ধান দেবে?

অস্থির পদে পায়চারী করেন অবনীমোহন। অপদার্থের দল! বেরিয়েছে তো আর পাত্তা নেই। A bunch of cowards! হয়ত. অবনীমোহনের চোখের আড়ালে গিয়ে সিদ্ধি ডলছে শালারা! ..

বেশ ছিল মানুষগুলো। অবনীমোহনের কড়া শাসনে শিরদাড়া নিচু করে বেড়াত সবাই। মাঠে চাষ দিত, চণ্ডীমণ্ডপে জটলা করতো এলোমেলো ভাবে। তারপর ফসল উঠলে জমিদারবাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতো। আবার চাষের সময় এলে একটা অস্থির উৎসাহে হাল নিয়ে মাঠে নেমে যেত ওরা। স্বপ্নের জাল বুনতো, শূন্য গোলা মাটি দিয়ে পরিপাটি করে নিকিয়ে দিত মেয়েরা। রাত্রে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে রূপোর মল, কি নাকছাবি, কি নীল শাড়ীর বায়না ধরতো। আর মানুষগুলাও প্রতিশ্রুতি দিতে কার্পণ্য করতো না। এমনি একঘেয়ে নিয়মে গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি। এক-এক সময় এই একঘেয়েমী অসহ্য মনে হত অবনীমোহনের।

বৈচিত্র্যহীন জীবন। একটা ভারী গোছের চুরিও কদাচিৎ যদি ঘটে, তাকেই ভাগ্য বলতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সর্বংসহ বাসুকির দল মাথাচাড়া দিল আর আগুন জ্বলে উঠলো। থানা পুড়লো, পোষ্ট অফিস পুড়লো—পাশাপাশি পনের-বিশটি গাঁ থেকে বনেদী সাম্রাজ্যবাদের অতি পুরাতন চিহ্নগুলি বিলীন হয়ে গেল। তারপর সেই ভস্মস্তূপের ওপর ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল কর্কশ চওড়া হাতে। আর তার পর একটা অস্পষ্ট কম্পিত আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো ওরা—মুক্ত স্বাধীন। কোন রকমে, একবস্ত্রে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ দারোগা অবনীমোহন।

কেউ বলে দেয়নি, তবু ওরা মনে মনে অনুভব করলো এই দিগন্তবিসারী ফসলের সোনা, এই মাটি, এই পৃথিবীর অকৃপণ আলো-বাতাস এ সব কিছুর ওপরই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠের মধ্যে

এসে দাঁড়িয়ে থাকে ঈশান। চোখ জুড়িয়ে যায়। রুক্ষ কঠিন মুখটা যেন অপত্যস্নেহে কোমল হয়ে আসে।

পথ দিয়ে আসছিল রসিক, ঈশানকে অমন সম্মোহিতের মত দাড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো :

আরে কেও, ঈশান না—অমন নিঝুম মেরে দাড়িয়ে রইছ ক্যানে ?

দেখতেছি ; কেমন লজ্জিত ভাবে হাসে ঈশান—এই জমি-জমা সব আমাদের হয়ে গেল ; তারপর একটা কম্পিত আবেগে ফেটে পড়ে মানুষটা।

বোচা বোচা মাস ছয়েকের শিশুটাকে মাই দিতে দিতে স্বপ্নালু ভাবে তাকিয়ে থাকে রাধা। ঐ উধাও মাঠের ওপর দিয়ে একদিন এ গাঁয়ে এসেছিল রাধা।

অল্প কিছু জমি-জমা ছিল, আর ছিল শক্ত সবল বাহু ঈশানের। স্বপ্ন ঘনিয়ে এসেছিল ওদের জীবনে—ঈশানের রুক্ষ কঠিন মুখে লেগেছিল কেমন একটা পরিতৃপ্ত প্রসন্নতার ছাপ। একটা অভাব শুধু পীড়া দিত, একটা শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করত ঘরবাড়ি। কত কবচ-মাদুলী, কত তুকতাক্—তবে না বাজা দুর্নাম ঘুচলো রাধার !

ঘোলাটে হলুদ রঙ লেগেছে ধানের ক্ষেতে—আর স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছে মানুষগুলার জীবনে।

কিন্তু চুপ করে বসে থাকার লোক নন অবনীমোহন। ওরা আসছে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে। তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ পড়ছে গ্রামে প্রান্তরে।

রুক্ষ নোংরা মানুষগুলো আবার জটলা করলো, তামাক খেলো, কাশল আর চিৎকার করলো এলোমেলো ভাবে। তারপর আধ-পাকা ধান কেটে এনে আগুন লাগিয়ে দিল থমথমে গম্ভীর মুখে।

কিছু থুয়ে যাব আটকুড়ের বেটাদের জন্য—মুখে ছাই স্নমুন্দিদের।

ধানের স্তূপ সামনে নিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে ঈশান।

বসে আছিস যে, আগুন দে—এসে পড়বে যে ওয়ারা।

তারপর ঈশানের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে নিজেই আগুন লাগিয়ে দিল রাধা।

যা, পুড়ে গেল!

একটা ফাটা আর্তনাদের মত শোনাল ঈশানের কণ্ঠস্বর। পুড়ে গেল, পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওদের সযত্ন-লালিত স্বপ্ন-সম্ভাবনা। আর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকল ভস্মস্তূপ।

তারপর স্নরু হয় হিংস্র শ্বাপদের মনুষ্য-শিকার। পরিত্যক্ত ঘর-বাড়িতে আগুন জ্বলে, শেষে মানুষ খুঁজে না পেয়ে গুলি চালাতে থাকে ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে!

একটা গুলি এসে লেগেছিল রাধার কোলের ছেলেটার পিঠে। ঝোপের কালো কালো স্তব্ধ মুখগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু করবার নেই—শুধু হাতে ত বন্দুকের মহড়া নেওয়া যায় না!

কুকুরগুলা—দাতে দাত চেপে পিছন থেকে কে একজন বলে ওঠে।

আর চারিদিকের আবহাওয়াটা কেমন অপ্রাকৃত হয়ে থমথম করে। অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে দূরের পুলিস-ক্যাম্পের আলোগুলো মিটমিট করে জোনাকীর মত। জনমানবহীন ভূতুড়ে গাঁ একটা দম-আটকে-আসা নিস্তব্ধতায় মূর্চ্ছিত হয়ে থাকে।

দূরে ভারী বুটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—ফিরে আসছে টহলদারবাহিনী।

হুজৌর এক আদমী কো পাকাড় লাতা—

দূর থেকে একটা লোককে হিঁচড়ে টেনে আনতে দেখে স্নসংবাদটা বড়-বাবুকে না জানিয়ে থাকতে পারে না ক্যাম্পের পাহারাদার সিপাই।

কিন্তু আসামী একটা বোকা-বোকা চাষী মেয়ে। হাবিলদার জানাল, পা টিপে-টিপে ক্যাম্পের দিকে আসছিল মেয়েটা। হাতে ছিল কেরাসিনে ভেজান ন্যাকড়া আর দেশলাই।

হুঃ, কি করতে আসছিলি এদিকে? হাবিলদার অবধি ভয় খেয়ে যায় এমনি ভাবে হুংকার দিয়ে উঠলেন অবনীমোহন।

আগুন দিবার চাইছিলাম ক্যাম্পে···আর—শান্ত অবিচল ভাবে জবাব দিল মেয়েটা।

'আগুন দিবার চাইছিলাম' হঠাৎ যেন সব রক্ত মাথায় চড়ে যেতে চাচ্ছে অবনীমোহনের। গুলি করে ওর ঐ নোংরা খুলিটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করলেও উদ্যত ক্রোধ চেপে জিজ্ঞাসা করলেন: কি নাম তোর?

রাধা

রাধা' ভেংচে উঠলেন অবনীমোহন, কেষ্টরা সব কোথায় গেল তোর?

হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে হাবিলদারটা। বড়বাবুর রসিকতা উপভোগ করেছে সে।

চোপ রও শালা খ্যাপা কুকুরের মত হঠাৎ খেঁকিয়ে ওঠেন অবনীমোহন। তারপর মেয়েটার হাত মুচড়ে ধরেন অবনীমোহন।

গাঁয়ের লোক সব কোথায় গেছে?

জানি না

জানি না—ঠাস করে একটা চড় পড়ল মেয়েটার মুখে। এবার চোখে কয়েক ফোঁটা জল দেখা গেল মেয়েটার—আশান্বিত হলেন অবনীমোহন।

কোথায় গেছে লোক সব?

জানি না

বলবি না তুই—দে তো শালীকে উলঙ্গ করে

মেয়েছেলে হুজুর—পেছন থেকে কে একজন একটা ক্ষীণ মন্তব্য করে।

দয়ার অবতারটি কে—এদিকে নিয়ে আয় তো বেটাকে। শালা কতদিন ঢুকেছে পুলিস লাইনে?

দু'হাতে কাপড়টা চেপে রাখার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করলো মেয়েটা।

নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছে অবনীমোহনের। ভদ্রলোক হলে কথা ছিল না—একটা সামান্য চাষীমেয়ে। একটা কিছু করা দরকার—খুন চড়ে যাচ্ছে অবনীমোহনের।

বলবি না? এই হাবিলদার ইস্‌কো বাহার লে যাও—সওয়াল করো

জঙ্গলের মধ্যে কঠিন মুখে বসেছিল ওরা। শেষে এক সময় গিয়ে রক্তাক্ত নগ্ন মৃতদেহটা টেনে নিয়ে এলো। অন্ধকারের মধ্যে ত্রস্ত নিঃশব্দে মা আর ছেলেকে পুঁতে রাখল একসঙ্গে। একটু মাটি উঁচু করে রাখল—স্মারক চিহ্ন।

পিতিবিধান হবে এয়ার—হবে, হবে—আনাড়ীর মত কে এক জন সান্ত্বনা দিল।

নিরর্থক একটা বিনিদ্র রাত কাটল অবনীমোহনের।

এই শালা উল্লু! হঠাৎ ক্রুদ্ধ হুংকারে চমকে ওঠে হাবিলদারটা। আপনা কোম্পানী লে'কর তামাম জঙ্গল ঢুড়কে দেখো।

বোকা বোকা মুখ করে বেরিয়ে যায় হাবিলদার। বাইরে ভারী বুটের সার দিয়ে দাঁড়ানোর আওয়াজ পাওয়া যায়—টেন্‌শন।

তারপর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সশস্ত্র দলটা।

কানাগলি

জব চার্নকের উপনিবেশ এগিয়ে গেছে, উত্তরে টালা আব দক্ষিণে টালিগঞ্জ পেরিয়ে। ঝলমলে মায়াময় একটা দেশ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর কলকাতা।

চৌরঙ্গী আর বালিগঞ্জেব ঔজ্জ্বল্যের আশেপাশে ধোঁয়া, কালি আর বদ্ধ হাওয়ার আলো-ছায়াময় বিচিত্র ল্যাণ্ডস্কেপ। কতটুকুই বা রাস্তা; ট্রামের শব্দ শোনা যায়, লরীর চাকায় বৃদ্ধ হাঁপানিগ্রস্তের পাঁজরার মত কেঁপে ওঠে ইঁট বের করা বাড়িগুলো। রেডিও মারফৎ চাঁদের দেশের হাতছানিও এসে পৌঁছায়। ছোট একটা কানাগলির ব্যবধান, তবু মনে হয় অনেক দূর।

গলিটা কর্পোরেশনের নয়—তাই আলো নেই, ময়লাও পরিষ্কার করা হয় না। সন্ধ্যার আগেই ধোঁয়া আর পূতিগন্ধে নেমে আসে অন্ধকার। ময়লা বাঁচিয়ে কোন রকমে হাতড়াতে হাতড়াতে বাড়িতে এসে ঢোকে শিবুর বাবা।

ছোট দোতালা বাড়ি। চুণবালি খসা বাড়িগুলো বড় রাস্তার ঝকঝকে প্রাসাদকে ঈর্ষায় ভেংচি কাটে। শিবুর বাবাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হয় কয়েক মিনিট—রুনু কাপড় ছাড়চে। এক ঝামেলা। বাথরুম নেই। গৃহিনী নন্দরাণীর অবশ্য আর আবরুর প্রয়োজন হয় না। ত্রিশোর্ধের পাসপোর্ট মিলে গেছে, তাই তার বসনের কার্পণ্যটা সর্বদাই চোখে পড়ে।

একটু তাড়াতাড়ি কর বাপু! ভালো লাগে না খেটে খুটে এসে··· তাড়া দেয় শিবুর বাবা।

নন্দরাণী ততক্ষণে উনুন ধরাবার প্রচেষ্টায় স্যাঁৎসেতে একতলাটা অন্ধকার করে তুলেছে। চোখ জ্বালা করে শিবুর বাবার। আর একবার তাড়া দেবার আগেই বেরিয়ে আসে রুনু।

এই একখানা তিনদিক বন্ধ ঘরেই নন্দরাণীর সংসার। এ বাড়ির আভিজাত্যের স্তরভেদ আছে। দোতলার ভাড়াটে অবিনাশবাবু আর তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মনোরমা ভিন্ন জগতের মানুষ। সুবিধে পেলেই উঠে যাবে অন্য জায়গায়।

দোতলার অপর অংশে থাকে বিজয়—বাড়িওয়ালা। বাড়ির মালিক নয়—সমস্ত বাড়িখানাই ভাড়া নিয়েছে সে। আগে নিজের ভাড়াটা উঠে যেত—এখন ঘরেও আসে দু'পয়সা।

অফিস থেকে ফিরে ময়লা বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে নির্জীবের মত চোখ বুজে শুয়ে পড়ে শিবুর বাবা। অর্ধেক মাইনে এ্যাডভান্স চেয়েছিলেন—পাওয়া যায়নি। বিজয় এক্ষুনি আসবে ভাড়ার জন্য।

ত্রিশের এদিকেই বয়েস বিজয়ের, বিপত্নীক, বিধবা বোন সত্তুর ঘাড়েই সংসার। সেই সত্তু গেছে শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুর মৃত্যুশয্যায়—যদি কিছু দিয়ে যায়! দেবে তো কাঁচকলা। এদিকে ভোগান্তির শেষ নেই। উনুন ধরাতে গলদঘর্ম হয়ে ওঠে বিজয়। 'কা তব কান্তা' বলে বিবাগী হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

যাত' মা, বাটি মেপে একবাটি তেল নিয়ে আয়তো ওপরের ওই ওদের কাছ থেকে।—রুনুর হাতে একটা বাটি দিয়ে বলেন নন্দরাণী। দ্বিধা করে লাভ নেই—সিঁড়ি বেয়ে ওঠে রুনু।

অবিনাশ বাবু বাড়ি নেই। সান্ধ্য প্রসাধনে শিথিল দেহভার ওঠাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না মনোরমার। দাঁড়িয়ে থাকতে বিশ্রী লাগে, উঞ্ছবৃত্তি ভালো লাগে না রুনুর।

কিন্তু মনোরমারই বা দোষ কি? অবিনাশ বাবু কত ঘুরে চোরাবাজার থেকে সংগ্রহ করে আনেন এই ঘানিভাঙা সরষের তেলটুকু। নন্দরাণী অবশ্য বাটি মেপে তেলটুকু ফেরত দেয়—কিন্তু সে সস্তাদামের ভেজাল কণ্ট্রোলের তেল। তবু মনোরমাকে উঠতে হয়। নেই বললে নন্দরাণী নিজে এসে

হাজির হবে, বোতল শিশি ঘাঁটাঘাঁটি করবে। ঘেন্না ধরে গেছে মনোরমার। অবিনাশ বাবুকে বলে বলে হদ্দ হয়ে গেছে—তবু বাড়ি বদলাবার নাম নেই।

‘ধুত্তোর’ বলে উঠে পড়ল বিজয়। হোটেল থেকেই চালিয়ে নেবে আজ। শিবুর বাবার কাছ থেকে ভাড়াটা বরং আদায় করে নিয়ে আসা যেতে পারে।

বিজয়কে দেখে জড়সড়ভাবে সিঁড়ির একপাশে সরে গেল রুনু।

এই যে, বাবা আছেন তোমার? নামতে নামতেই জিজ্ঞাসা করে বিজয়।

মাথাটা একটু কাত করে উত্তর দিল রুনু।

সিঁড়ির এ জায়গা থেকে ঐ রূপকথার রাজপুরীর একাংশ দেখা যায়। নিষ্প্রাণ, নিশ্চুপ, মনে হয় জনমানবহীন। কিন্তু সে তো মোহ মাত্র। জানলার ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল শাড়ীর ঝিলিমিলি দেখা যায়—পিয়ানোর দু’একটা ছিন্ন টুং টাং ভেসে আসে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে রুনুর।

টাকা পেলে?

নন্দরাণীর প্রশ্নের জবাবে চোখ বুজেই মাথা নাড়েন শিবুর বাবা।

বিজয়, তা এসো বাবা—জুতোর শব্দে মুখ না তুলেই বলেন নন্দরাণী। রান্না বান্না হোল? কি রাঁধলে?

সে আর বলেন কেন মাসিমা উনুনই ধরলো না। ও হোটেল থেকেই চালিয়ে নেব

সে কি বাবা, তাও কখনো হয়। আমরা আছি কি জন্যে! তা তোমার যদি আমাদের ঘরে খেতে লজ্জাই করে—রুনুই না হয় চারটি রেঁধে দিয়ে আসবে।

না না কি দরকার...একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বিজয়।

না, না লজ্জার কি আছে? তুমি যাও আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি রুনুকে।

অগত্যা ভাড়ার কথা আর বলা হয় না বিজয়ের।

রুনুর বসবার ভঙ্গী মনোরম। অবিনাশবাবু ফিরে এসেছেন। ওদের ঘর থেকে বিশ্রম্ভালাপের দু'এক টুকরো ভেসে আসে। রুনুর যাদুস্পর্শে উনুন ধরে গেছে। অনেক দিন পরে বিগত পত্নীর কথা মনে পড়ে। নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়—রুনুর পিছনে এসে দাঁড়ায় বিজয়। শীতের মধ্যেও ঘেমে ওঠে রুনু।

রাত ন'টার সময় ফিরে এল শিবু।

কিছু হোল? চোখ খুলে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে শিবুর বাবা।

না। হতাশায় মাথা নাড়ে শিবু, লোক সব ছাড়িয়ে দিচ্ছে

বিছানায় শুয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে রুনুর। ততক্ষণে অবিনাশ বাবুর কাছ থেকে নতুন শাড়ীর প্রতিশ্রুতি আদায় করে ফেলেছে মনোরমা। মনোরমার দৃঢ় কোমল বক্ষে স্বর্গসুখ অনুভব করেন অবিনাশবাবু।

শিবু আর সব বিলাসিতাই একে একে বর্জন করেছে, পারেনি শুধু একটি—সিগারেট। নেশাটা ওকে পেয়ে বসেছে। তবু অনেকটা সংযম অভ্যাস হয়েছে বৈকি। কলেজি জীবনে দিনে দু'প্যাকেটের কমে চলতো না—এখন চারটে জুটলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে শিবু। চা-টা বাড়িতেই পাওয়া যায়—না হলে এটিও ছাড়তে হোত। কিন্তু সিগারেট ছাড়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না শিবু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ছাড়তেই হয়। বেকারের আবার নেশা। উঞ্ছবৃত্তি আর কতদিন চলে!

বাবার সঙ্গে সম্বন্ধটা চিরকালই কম শিবুর। আর মাও এবার স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, আর এক পয়সাও তিনি দেবেন না। যে ছেলে এই যুদ্ধের

বাজারেও একটা চাকরী জোগাড় করতে পারেনি তার আবার পয়সার কি প্রয়োজন! সত্যি তো, যে গরু দুধ দেয় না গোয়ালে আর কে তাকে আদর করে পোষে! তবু একবার বাজিয়ে দেখতে ছাড়েনি শিবু। মেয়ে মানুষ হয়েও মা যাকে বলে একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন।

অগত্যা শরণ নিতে হয় ভাই বোনদের।

একটা টাকা ধার দিতে পারিস রুনু? চাকরীটা হলেই শোধ করে দেব।

সঞ্চিত তহবিল থেকে একটা টাকা বার করে দেয় রুনু। ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি না থাকলেও দিত। সিগারেট না পেলে যা অবস্থা হয় শিবুর সহ্য করতে পারেনা রুনু। সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আসে শিবু। যেখানেই থাক ছুটে আসবে রুনু। হাওয়া করবে; তারপর উদগ্র আশায় প্রশ্ন করবে—কিছু হোল দাদা?

না, হোল আর কই! হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে শিবু। তারপর আবার একটু আশা দেয় রুনুকে; বোধ হয় নিজেকেও।—একটা ইন্টারভিউ পেয়েছিলাম; হয়ে যাবে বোধহয় এবার।

মিথ্যা আশ্বাস—তা রুনুও জানে, শিবুও জানে। তবু দু'জনেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, তাই যেন হয় ভগবান, তাই যেন হয়।

কিন্তু চাকরীটা হলে তুই কি নিবি বলতো রুনু? আর অজু তুই কি নিবি?

রুনু কিছু বলল না, অজু বলে—আমি একটা ফুটবল নেব দাদা; ওই ওদের বাড়ির ছেলেটার মত বড় ফুটবল।

রূপকথার রাজপুরীর দিকে আঙুল দেখিয়ে দেয় অজু। তারপর আবার কি ভেবে বলে—আমার একটা টাকা আছে নেবে দাদা? হয়ত টাকা ঘুষ দিয়ে ফুটবলের প্রতিশ্রুতিটা পাকা করে রাখতে চায় অজু।

কি জানি কেন হঠাৎ কান্না পায় শিবুর। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—এখন থাক দরকার হলে নেব।

কি খেয়ে দেয়ে উদ্ধার করতে হবে, না বসে বসে আড্ডা দিলেই চলবে? পারিনে বাপু, খেটে খেটে হাড়মাস কালি হয়ে গেল।

নন্দরাণীর নোটিস এসে গেছে। উঠে পড়ে শিবু—রুনুর কথা আর শোনা হয় না।

শিবুদের ঘরে বিজয়ের আনাগোনা বেড়ে গেছে আজকাল। সতুকেও তাড়া দিয়ে চিঠি লেখে না আর—ধীরে সুস্থে মরুক সতুর শ্বশুরটা। একেবারে একটা বন্দোবস্ত করেই আসুক সতু।

পছন্দ হয়না শিবুর এসব। কিন্তু কে শোনে তার কথা! বেকারের আবার মতামত! তবু শিবুও বিজয়ের দাদার পদে উন্নীত হয়ে গেছে—যদিও বয়সে সে বিজয়ের ছোটই হবে। আপ্যায়নের ত্রুটি করে না বিজয়।—হেঁ হেঁ শিবুদা, হোল কিছু? হবে না তা জানিই—অতি সাধু হলে হয় না কিছু এ বাজারে। আমার সঙ্গে চলুন দু'দিন, ঘরে পয়সা আসে কিনা দেখবেন।

কষ্ট করে আবার একটু হাসে—একটা দামী রসিকতা করে ফেলেছে বিজয়।

ঘুষি মেরে বিজয়ের ঐ পান খাওয়া দাঁতগুলো উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে শিবুর। কিন্তু তা তো আর হবার উপায় নেই। বাড়ি ভাড়ার তাগাদা তো করেই না বরং মাঝে মাঝে বাজারটাও নিজের পয়সায় করে এনে দেয় বিজয়।

তবু রুনুকে বলেছে শিবু—তোর কি দরকার বিজয়বাবুর রান্না করে দেবার?

কিন্তু রুনু কি করবে? নন্দরাণীর জিভের ধার তো শিবুরও জানা আছে। কামাগলিটা চারিদিক থেকে ছোট হয়ে আসছে সংকুচিত হয়ে আসছে পুতুল

নাচের আসর। কি করবে শিবু! বুঝতে পারছে শিবু, ভাঙন ধরেছে ভাঙছে। বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে জীবন! কিন্তু কি করে বন্ধ করবে এ ফাটল? একটা চাক্‌রী, একটা চাক্‌রী, চাই তার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা চাক্‌রী। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারে শিবু!

রাত দশটা বেজে গেছে, এখনও ফেরেননি শিবুর বাবা। কি আবার হোল কে জানে? খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে শিবুদের। শিবুর বাবার ভাত ঢাকা আছে, যখন আসেন খাবেন। তার জন্য ভাতের থালা আগলে বসে থাকবেন নাকি নন্দরাণী। ছাতে এসে একটা সিগারেট ধরাল শিবু।

আর কতক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা যায়। ফিরে এলেন শিবুর বাবা।

দাদা চাকরি গেছে বাবার! কান্নার মত শোনাল কমুর কথা।

কোন কথা জোগায় না শিবুর। তেতো লাগে সিগারেট, বিষ তেতো। আধখানা সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেয় শিবু।

কানগলিটা নির্জন অন্ধকারে থম্‌কে থাকে। রূপকথার রাজপুরী থেকে ভেসে আসে চাপা হাসি আর আনন্দের ছিন্ন কাকলী।

চাঁদ

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আকাশে চাঁদ উঠ্‌লো—জ্যামিতিক বৃত্তের মত নিখুঁত গোল চাঁদ। কেমন একটা ঝিরঝিরে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অপ্রাকৃত দেখাল বণিকপুরী।

জন-বিরল হয়ে এসেছে এদিকটা—এখন আর ঘন ঘন ট্রাম আসছে না। এ অফিস, সে অফিস করে সারাদিন ঘুরেছে অমর, আর পারা যাচ্ছে না। বসে পড়তে ইচ্ছে করছে কোথাও। ক্ষিধেয় পেট জ্বল্‌ছে।

গুণে গুণে ছ'টি পয়সা আছে পকেটে। দু'পয়সা দামের একটা সিগারেট ধরিয়ে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ে বসবে, না এক কাপ চা খেয়ে হেঁটে যাবে—কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না। উদ্দেশ্যহীনভাবে সারা ডালহৌসী স্কোয়ারটাকে একবার চক্কর দিল অমর।

এক কাপ চা খেয়ে নিলে ক্ষিধেটা চাপা পড়ে, কিন্তু তাহলে হাঁটতে হয় পাকা দেড় মাইল পথ। চা খেলে যখন হাঁটতে হয়, তখন ক্ষিধের প্রশ্নটা বাতিল করে দেওয়াই উচিত। একটা ট্রাম আসছে। এগিয়ে এলো অমর। কিন্তু না, কালীঘাটের ট্রাম।

নোটিসের বদলে এক মাসের মাইনে পেয়েছিল—তারপর দেড মাস হতে চললো বেকার।

বাড়ি ফিরলেই মা এসে দাঁড়াবেন উদগ্র প্রত্যাশা নিয়ে। জিজ্ঞাসা করবেন : কিছু হল ?

বোন গৌরীও এসে দাঁড়াবে। দিন দিন ফেঁপে-ফুলে মাগী হয়ে উঠছে মেয়েটা। দেখলেই গা জ্বালা করতে থাকে। গলা টিপে দিতে ইচ্ছে করে এক এক সময়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বলা হয় না—কেমন একটা অসহায় গরুর মত চোখ মেলে তাকায়, যে মায়া হয়। ওর চোখ দু'টো যেন বলতে চায়—আমায় মেরনা দাদা, আমার কোন দোষ নেই। কিন্তু দোষ তো কারো একটা থাকা চাই !

কিন্তু ট্রাম আসছে না। ক্ষিধেটা যখন বাতিল করে দেওয়া গেছে, তখন হেটে গেলেই বা কেমন হয়? ক্ষিধেটা চনচনিয়ে উঠলে মনে করা যাবে ট্রামে চড়েছি, আর পা টন টন করলে মনে করা যাবে চা খেয়েছি—মনে মনে ভাবল অমর। আর কেমন খুশি হয়ে উঠলো। ভাল বুদ্ধি বাৎলান গেছে। মাত্র ছ'টিই পয়সা আছে, আর তা খরচ করা উচিত নয়। মার কাছে আর হাত পাতা চলে না।

কই কিছুইত খেলে না, মিষ্টি করে অনুযোগ দিল মিলি।

বারে এত অনেক খেলাম, বিপন্নভাবে বলে সুব্রত।

খুব খেয়েছ, একখানা সিঙ্গাড়া আর একটা চপের অর্ধেক। এ সব আমার নিজের হাতের তৈরী

তাতো বুঝলাম, কিন্তু আমার পেটটা তো আগ্নেয়গিরি নয়

আচ্ছা, ঐ সন্দেশটা খাও তাহলে—

কাঁদ কাঁদ মুখে অর্ধেকটা সন্দেশ ভেঙে মুখে পুরে দিল সুব্রত। তারপর এক-ঢোঁক জল খেয়ে বললো :

তোমার কথাও থাকল, আমার কথাও থাকল—এই অর্ধেকটা খেলাম। দোহাই তোমার, আর যেন পীড়াপীড়ি কর না। এবারে চল বেরোই।

কোন্‌দিকে যাবে?

চলই না

দাঁড়াও, আসছি

একটা ছন্দোময় ভঙ্গীতে ভেতরে চলে এলো মিলি। লাইফ সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, শাড়ীর ভাজগুলো ঠিক করে নিল। ছোট্ট রুমালটি দিয়ে আলতো করো মুছে নিল কপালের ওপর জমে ওঠা মুক্তা-শুভ্র স্বেদবিন্দু। তারপর পাউডারের পাফটা মুখে, গলায়, ঘাড়ে বুলিয়ে নিল একবার। রেডি।

ওদের নিউ মডেলের বুইকটা ছুটে চল্‌লে এসপ্লানেডের দিকে।

অন্যমনস্কভাবে হাটতে গিয়ে কার্জন পার্কে এসে পড়েছে অমর। সোজা বৌবাজার ধরলে হাঁটুনী বাঁচত। আকাশে চাঁদটাকে দেখাচ্ছে একটা অমলেটের মত। কেমন একটা ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি। এক ঝাঁক সাদা মৌসুমী ফুল ফুটে আছে একদিকে—যেন ভাল বালাম চালের একথালা ঝুরঝুরে ভাত। মনটা কেমন বিষিয়ে উঠছে। ইচ্ছে করছে সযত্নে রচিত সিজ্‌ন ফ্লাওয়ারের কেয়ারীগুলো লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

কিন্তু ছটা পয়সা বাঁচিয়েই বা কি লাভ। বড় জোর আর একদিন চল্‌বে, সেই মায়ের কাছে ত' হাত পাততেই হবে। চাল ফুরিয়েছে—রেশনও আনতে হবে। সুতরাং টাকা ধার করতেই হবে। অতীন জানে চাকরী গেছে, ওর কাছে ধার পাওয়া যাবে না। বিমল, রমেন, সুরেশও জানে, জানে না একমাত্র সুধাংশু। সুধাংশুর কাছেই হাত পাতা যেতে পারে। এখন সুধাংশুকে পাওয়াও যাবে। জগুবাবুর বাজার—পা চালিয়ে গেলে আর কতক্ষণ লাগবে। গৌরী সম্পর্কে একটু দুর্বলতা ছিল সুধাংশুর। বললেই হবে—গৌরীর খুব অসুখ। সুধাংশু বিমুখ করবে না নিশ্চয়ই। ছ'পয়সা দিয়ে বরং এক কাপ চা-ই খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ট্রামে গেলে তাড়াতাড়ি সুধাংশুর সঙ্গে কারবারটা মিটিয়ে ফেলে আসবার সময় চা খেয়ে নেওয়া যাবে।

পেটের মধ্যকার জ্বালাটা এতক্ষণে যেন একটু কম পড়েছে। চাঁদের ওপর এসে পড়েছে সাদা একখণ্ড মেঘ। হাসি পেল অমরের, এ নিয়ে নাকি লোকে কবিতা লেখে। Silly fools।

একরাশ ফুল নিয়ে সম্রাজ্ঞীর মত নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এল মিলি। মুগ্ধদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সুব্রত।

কি দেখছো ?

দেখছি কে বেশি সুন্দর, ফুলগুলি না মিলিরাণী !

যা কি যে বলো, গালে টোল ফেলে একটা অপরূপ ভঙ্গীতে হাসল মিলি। তারপর চোখ পড়ল আকাশের দিকে। বাঃ কি চমৎকার চাঁদ উঠেছে দেখেছো ?

সত্যি, অপরূপ। আমার সেই কবিতাটা মনে পড়ছে

Tender is the night
And haply the queen moon is on her throne.

আবেগে বুজে আসা গলায় মিলি বলল—চল রেড রোড ধরে চলে যাই যে দিকে খুশি।

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে একটা পাক খেয়ে ময়দানের রাস্তা ধরল বুইকখানা।

সত্যি অপরূপ দেখাচ্ছে এসপ্লানেডকে। নীয়ন গ্যাসের আলোয় রচা কল্পলোক—মুগ্ধ হওয়া উচিত কিনা এক মুহূর্ত ভাবল অমর। চোখের সামনে দিয়ে একটা ট্রাম বেরিয়ে গেল। দূরে দেখা গেল একটি নারীমূর্তি। সামান্য একটা আটপৌড়ে শাড়ীতে রামধনু রঙা বিস্ময়। চলার ভঙ্গীটা কেমন পরিচিত মনে হচ্ছে। সবিতা রায়, নীলিমা সান্যাল না লিলি মিত্র ? সেই নাক উঁচু মেয়েটা ? এগিয়ে আসছে এদিকে লিলি মিত্রই হবে।

কিন্তু এইবার গা ঢাকা দেওরা দরকার। তখন চাকরী ছিল—লিলি মিত্রের নাক উঁচুপনাকে থোড়াই কেয়ার করত অমর। অবশ্য ভয়ও নেই বেশি। বদলী হওয়ার আগে অবধি একঘরে এক সঙ্গে পাঁচ বছর কাজ করলো, তাই কোনদিন কথা বলেনি লিলি—আর আজতো অমর বেকার।

আরে, অমরবাবু না ?

দেখে ফেলেছে লিলি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত অপ্রতিভ দেখায় অমরকে।

হ্যাঁ এইতো দাঁড়িয়ে আছি ট্রামের জন্য। তারপর আপনি কোথা থেকে ?

বাড়ি ফিরবো আর কি। অল্প একটু হাসিল লিলি। অপরূপ দেখাচ্ছে

লিলি মিত্রকে। অমরের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। ব্যাপার কি, লিলি যেন একটু প্রশ্রয় দিতে চাইছে অমরকে। তবে কি ওর সম্পর্কে একটু দুর্বলতা ছিল নাকি লিলি মিত্রের? যদি ওর কাছেই পাঁচটা টাকা ধার চাওয়া যায়?

ট্রাম আসছে না। শ্যামবাজারের ট্রামের জন্য দাড়িয়ে থাকলে অনবরত ভবানীপুরের ট্রাম আসবে, আর আজ ঠিক উল্টো।

কোন দিকে যাবেন? লিলি জিজ্ঞাসা করলো।

ভবানীপুর

তাহলে তো এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে

লিলি মিত্রের হৃদয় দৌর্বল্য সম্পর্কে এতক্ষণে যেন নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে। টাকাটা এবার চেয়ে ফেল্‌লেই হয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করাটা বোধ হয় দৃষ্টিকটু দেখাবে।

একটা ট্রাম আসছে। ট্রামে উঠেই পাড়া যাবে কথাটা।

আসুন, লেডীজ সীটের অর্ধাংশে অমরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায় লিলি।

কণ্ডাক্টার এলে পয়সা বার করতে দেরী করতে হবে—তাহলে ভদ্রতার খাতিরে লিলি নিশ্চয়ই পয়সাটা দিয়ে দেবে। পয়সা কটা বাচানই ভাল, কি জানি যদি ধার না পাওয়া যায়। ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার অব্দি হাঁটতে হবে তা হলে কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা ভাল দেখায় না। জ্যোৎস্না নিয়ে খানিকটা কাব্য করা যেতে পারে। তারপর আলাপটা একটু জমে উঠলে কোন এক ফাঁকে টাকার কথাটা পাড়া যাবে।

এক খণ্ড কালো মেঘে অর্ধেকটা চাঁদ ঢাকা পড়েছে।

তারপর কেমন আছেন? জিজ্ঞাসা করল লিলি। কতকাল পরে দেখা হল আপনার সঙ্গে

এইত, কোন রকম, হাসি হাসি ভাব করল অমর।

স্পীডো মিটারেতে চল্লিশ থরো থরো—মিলির চূর্ণ কুন্তল এসে পড়ছে সুব্রতের চোখে মুখে। কেমন একটা বিহ্বল সুগন্ধ।

আজ আমার কি ইচ্ছে করছে জান?

কি? সুডৌল গ্রীবাটি বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল মিলি।

ইচ্ছে করছে মরে গিয়ে ম্যাগনোলিয়া হয়ে ফুটে উঠি

যাও, কি যে বল

কৃত্রিম ক্রোধে গম্ভীর দেখায় মিলিকে।

কোন রকমেই আলাপ এগোয় না। বারে বারে খেই হারিয়ে যায় কথার। কী একটা বলবে বলে যেন উস্‌খুস্ করে লিলি মিত্র।

ভারী চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে না?

এতক্ষণে ঠিক পথে আসছে আলোচনাটা—পুলকিত হয়ে ওঠে অমর। বলেঃ সত্যি চমৎকার।

কিন্তু—কেমন ইতস্তত করছে লিলি। ততক্ষণ এলগিন রোড ছাড়িয়ে গেছে।

এইবার টাকার কথাটা বলে ফেলা দরকার মনে মনে ভাবল অমর। কিন্তু এখনও কথা শেষ করছে না লিলি। মেয়েগুলোর যে কি এক স্বভাব সাজিয়ে গুছিয়ে ছাড়া কোন কথা বলবে না। সোজা করে বল্‌লেই হয় —অমরবাবু আপনাকে আমি ভালবাসি।

আমাদের মত লোকের কাব্য করা সাজে না—ততক্ষণে কিভাবে কথাটা বলবে ঠিক করে নিয়েছি লিলি মিত্র, এই ধরুন মায়ের অসুখ—অথচ ৬'মাস চাকুরী নেই আমার···

এই কণ্ডাক্টার রোখো রোখো। হঠাৎ ব্যস্ত সমস্তভাবে উঠে পড়ল অমর, দেখেছেন কথায় কথায় ষ্টপেজটা পেরিয়ে এসেছি

রাস্তায় নেমে হাফ ছেড়ে বাচল অমর। আর একটু হলেই টাকা ধার চেয়ে ফেলেছিল মেয়েটা। সুধাংশুর বাড়ি যেতে এখনো হাটতে হবে, কিছুটা তা হোক।

আকাশে আধবোজা চাঁদ ভেংচি কাটল।

বাতাসে খবর এলো, সুরু হয়ে গেছে।

মুহূর্তে থমকে গেল এলাকাটা। একজন এসে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলো :

কি হয়েছে দাদা ?

লেগে গেছে, আবার কি !

কোথায় ?

এইবার বিব্রত বোধ করেন ভদ্রলোক -কোথায় হয় জানেন না বুঝি ?

লোক জমছে, জটলা হচ্ছে—বাতাসে খবর এসেছে, সুরু হয়ে গেছে !

লেবা বাবু ছ' আনা—যা লিবে তা ছ' আনা !

অস্বস্তির ভাবটা কাটাবার জন্য একবার বলে উঠলো ইরশাদ।

না, কাজ ভাল হ'লো না ! না ভালো হলো না !

নিশ্চিন্ত মনে যে ভদ্রলোক এই ক'দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন বাড়ি ফিরতে হোল তাকে।

ট্রামের ভদ্র মহিলাটিকে সবাই মিলে জোর করে নামিয়ে দিল : লেগে গেছে !

এইমাত্র ওদের চারটে হ'য়ে গেল…খবর দিল এসে একজন।

কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না

এহে, কে আমার দরদী এলেন রে ! জানেন রাজাবাজারে কি হয়েছে ? নিজ থেকেই একটা কৈফিয়ৎ তৈরী করে লোকটা।

কি হয়েছে মশাই ? কি হয়েছে ?

ছোটখাট একটা ভীড় ঝুঁকে এলো।

আমিত' এই এলাম রাজাবাজারের ওপর দিয়ে কিছু দেখলাম না ত'

ওই হোল, রাজাবাজারে না হোক শেয়ালদা'য় হয়েছে—ওই একই কথা !

তারপর আর দেখা গেল না লোকটাকে।

একটা পাগল কি মনে করে তিনবার হাততালি দিল। আশ্রয়ভ্রষ্ট পায়রার ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াল কয়েকবার। একটা ট্রাম এসে থেমে গেল—আর যাবে না। সুরু হয়ে গেছে।

এতক্ষণ তবু সাহসে ভর করে দাঁড়িয়েছিল ইরশাদ—কিন্তু আর ভরসা নেই। আকাশে বাতাসে খবর এসেছে—সুরু হয়ে গেছে।

প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে নি ইরশাদ। কিছু একটা হয়েছে—জটলার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল সেও।

কি হয়েছে?

কেউ জবাব দিল না। তফাৎ যাক, ইরশাদ তফাৎ।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না ইরশাদ। একটা থমথমে আতঙ্ক অবশ করে আনে।

জাহান্নামের শীতল নিশ্বাস লেগেছে—হিমহিমিয়ে আসে বুকের ভিতরটা।

নাঃ দু দিনও শান্তিতে বাস করতে দেবে না—

অফিস যাত্রী ভদ্রলোক বিরক্ত হয়েছেন।

যতসব গুণ্ডাদের কাণ্ড

কলেজের ছাত্রটি বিক্ষুব্ধ।

যাই বলুন মশাই, একেবারে ঝাড়ে বংশে নিধন না করতে পারলে শান্তি নেই।

ওরা যেখানে বেশি, সেখানে তো আপনাদেরও নিধন করতে পারে

তা হোক, তবু শত্রুর শেষ রাখতে নেই

জটলা বাড়ছে। লেগে গেছে।

মুখটা ভরে উঠেছিল একটা নোনতা স্বাদে। থুতু ফেলতেই দেখা গেল খানিকটা তাজা লাল রক্ত। তারপর সেই লাল রক্ত কালসে হয়ে জেগে রইলো রঙচটা দেওয়ালের ওপর।

তারপর কাশীটা লেগে থাকলেও আর কোন দিন রক্ত ওঠেনি।

ও কিছু নয়, গলাটা চিড়ে গিছল সম্ভবত—এক ডোজ ক্যালকেরিয়া ফস খেলেই সেরে যাবে।

বিনয় তাই বোঝাল নিজেকে—কারণ অফিস কামাই করা চলবে না।

আতঙ্কের হিমেল কালো হাওয়া বয়ে গেল অফিস অঞ্চলের ওপর দিয়েও।

ট্রাম বাস চল্‌ছে তো? কি করে ফিরবো?

লাগালো কারা?

বেশ ছিলাম কিন্তু ক'টা দিন শান্তিতে—আবার তো সেই প্রাণ হাতে করে অফিসে আসা!

মনে পড়লো বিনয়ের ঠাকুর প্রণাম করে আসা হয়নি আজ। আর বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করে উঠলো।

যদি কোথাও কিছু হয় পথে।

কিছু না, সম্ভবত গুজব!

কিন্তু যা রটে তার কিছু বটে

কিন্তু লাগালো কারা?

ওরাই—উত্তরের জন্য ভাবতে হয় না।

ক্যানিং ষ্ট্রীটে একজন পথচারীর কাছ থেকে আর একজন ঠিক ঐ একই উত্তর শুন্‌লো।

আর ভরসা নেই।

বোথার ছিল লেড়কীর—দাওয়াইর পয়সাটা ওঠে নি, কারবার গোটাতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আর ভরসা নেই। লেগে গেছে। কেমন যেন হিংস্র দেখাচ্ছে লোকগুলোকে।

আসবার সময় কেঁদেছিল ফতিমা! আব্বাজান মাত্ যাইয়ে

বড় অবুঝ মা মরা মেয়েটা। দাওয়াইয়ের পয়সাটা তো চাই।

মেওয়া লিয়ে আসবো ঃ বুঝিয়ে রেখে এসেছে ইরশাদ।

মাত যাইয়ে : বড় অবুঝ ফতিমা। আসবার সময় মানা করেছিল।

দাওয়াইয়েব পয়সা ওঠে নি, কারবার গুটোতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আর ভরসা নেই। হিংস্র দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। পাগলটা থমকে এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

চলে যাও ভাই, আর থাকাটা ঠিক নয়..বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথায় যেন খেয়াল হল ইরশাদের।

চলা যাইয়ে—

ঝাঁকামুটে গোছের একজন জিনিসগুলো গুছিয়ে দিল। জিনিস অবশ্য সামান্যই। কিছু খাতা পেন্সিল, কিছু আমেরিকান চিরুনী আর কিছু ডিসপোজালসের চকোলেট।

যা লিবে তা ছ'আনা।

জানালায় শঙ্কা কুটিল নাবী মুখটি দেখা গেল আর একবার। আফিসে তো গেছে লোকটা, কি আবার হোল কে জানে! বিনয় বাড়ি ফেরা পর্যন্ত জানালা আর ছাদ—ছাদ আর জানালা করতে হবে সরমাকে।

হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করেছে লোকগুলো। হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে আসে সরমার। কেন যে লোকগুলো অমন মারামারি করে মরে!

খবর এসে গেছে ফতিমাদের বস্তিতেও।

থমকে বসে রইলো মিঞা আবদুস শোভান।

আব্বাজান। শোভান ভাইয়া, আব্বাজানত নেহী আয়া আভিতক।

মানা না শুনেই বেরিয়ে গেছে ইরশাদ।

ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

আর দেরী নয় হেঁটেই রওনা দিতে হবে। কোথায় কখন কারফিউ দিয়ে দেয় কে জানে।

ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে যাওয়াই সেফ—কি বলেন ?

সায় দিল বিনয়।

দাঙ্গার ভয় করি না, ভয় মিলিটারীর—শালাদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে !

তবে ভরসা এই এবার গভর্ণমেণ্ট আমাদের হাতে

তাহলে কি হয়—আমাদের নেতারা আবার বেশি সাধু যে !

কিন্তু যাই বলেন, কাজ ভাল হল না

বড় দেরী করে ফেলেছে ইরশাদ।

জাহান্নামের আগুন লকলকিয়ে উঠেছে চারিধারে।

আসছে, আসছে

চারিদিকে ছুটতে আরম্ভ করেছে মানুষগুলো।

শালা পালাচ্ছে

ইয়া, আল্লা

মার, শালাকে !

আহা হা ছেড়ে দাও না, বুড়ো মানুষ—

কেরে দরদ দেখানেওয়ালে ?

ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পরে ছাত্রটি।

আব্বাজান, মাত যাইয়ে !

আসবার সময় মানা করেছিল লেড়কি।

মার শালাকে !

রাতে বিছানায় শুয়ে প্রশ্নটা আবার মনে এলো বিনয়ের। দেওয়ালের ওপর রক্তের সেই কালো দাগটা দেখে উদয় হল প্রশ্নটার।

ফুটপাথে জমাট বাধা রক্তের দাগটা দেখবার পরই প্রশ্নটা মনে জেগে-ছিল বিনয়ের। কিন্তু লাশটা সরিয়ে নিয়ে গেছে আগেই। শুধু কয়েকটা খাতা, কয়েকটা পেন্সিল,, কয়েকটা আমেরিকান চিরুনী, আর ডিসপোজালসের চকোলেট কিছু রক্তে মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে আছে।

রক্তের ওপর চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে উঠেছিল বিনয়ের। আতঙ্কের ধাক্কাটা কেটে যাবার পর প্রশ্নটা মনে জেগেছিল : হিন্দু না মুসলমান।

কিন্তু লাশটা সরিয়ে নিয়ে গেছে।

ফুটপাথে জমাট বেধে কাল্‌সে হয়ে আছে রক্তের দাগটা—দেয়ালের সেই রক্তের দাগের সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই।

লাশটা সরিয়ে নিয়ে গেছে—আর শুধু রক্তের দাগ দেখে বোঝবার উপায় নেই, হিন্দু না মুসলমান।

দারোগার বৌ

এরি নাম বোধ হয় নির্বন্ধ। পরীক্ষায় পাস তো করলই ছবি—এ কি দেনা পাওনার ফাঁড়াটাও কেটে গেল নির্বিঘ্নে।

শাস্ত্রেই আছে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এ তিনের ওপর কারো হাত নেই নইলে এর থেকে কত খারাপ সম্বন্ধ কত সামান্য ওজরেই না ভেঙে গেল। রসময়বাবু তো আশাই করতে পারেননি, এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন তিনি। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ তো আর মিথ্যা হবার নয়।

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। দ্বিতীয় পক্ষ, তা হোক—ছেলেটি দারোগা। বয়স বেশি নয়—ছেলেপুলেও নেই। সুতরাং আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া বইকি। গাঁয়ের লোক যদি ছবিরাণীর সৌভাগ্যে ঈর্শান্বিত হয়, তাহলে তাদের দোস দেবার কিছু নেই। কেউ যদি দ্বিতীয় পক্ষের কথাটাই জোর করে খুঁচিয়ে তুলতে চায়, তাদেরও মার্জনা করা যায়।

বিবাহের আয়োজনটা তাই একটু ঘটা করেই হ'ল। ঘটা মানে রাজসূয় ব্যাপার তা নয়। তিনদিন আগে থাকতে যে নহবৎ বসেছিল তা নয়—তবু পাড়াগাঁয়ের পক্ষে একে ঘটাই বলতে হবে। নহবৎ না বসুক, আত্মীয়-স্বজন থেকে আরম্ভ করে পাড়ার কোন লোককেই আর নিমন্ত্রণ করতে বাকি রাখেননি রসময়বাবু। রোদ ঝিমিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুখর হয়ে উঠেছে বাড়িটা।

যাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন, সেই ছবিরাণী কিন্তু ঘেমে উঠছে। না, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, কোন পূর্বরাগের ব্যাপার নয়। আর তা ছাড়া বিয়ের রাতে কোন মেয়েই আর ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না।

তবু ছবিরাণীর সময়টা যেন আজ বড় দ্রুত কেটে গেছে। দুপুরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন বিকেল হয়ে গেল, আর তারপরই এসে গেল লগ্ন। তারপর

কখন যে সাতপাক ঘোরা শেষ, কখন যে শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান সমাপ্ত, কিছু মনে
যতে পরেছে না ছবিরাণী। হঠাৎ ছবিরাণী নিজেকে আবিষ্কার করলো
নর ঘরে।

ঘামের আর দোষ কি! দোর্দণ্ডপ্রতাপ দারোগা রাসবিহারীর সঙ্গে চোখা-
খি হলে দুর্দান্ত ডাকাতের অব্দি বুক কেঁপে ওঠে—ছবিরাণী কোন ছাড়!
মহিষমুণ্ডার ঈশেন ডাকাত—পুলিস অব্দি যার ভয়ে কাঁপে; রাসবিহারীর
শুধু চোখের দৃষ্টির সামনেই কবুল করে ফেলেছিল সব। এর আগে ছোট
দারোগা তিনখানা বেত ভেঙেছে ওর পিঠে—রা'টি কাড়েনি ঈশেন।

অমন রাশভারী দারোগা রাসবিহারী যদি ছবিরাণীর পায়ের তলায় লুটিয়ে
পড়ে, যদি একটু হাসবার জন্য মিনতি করে, যদি নেহাত ছেলেমানুষের মত
তাকে পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে, আর শেষ পর্যন্ত অমন পালোয়ান
লোকটা যদি জড়িয়ে ধরে এবং রাসবিহারীর বুকের চুল নাকে ঢুকে যদি হাঁচি
পায় এবং তা সত্ত্বেও যদি ভয়ে হাঁচতে না পারে—তা হলে ছবিরাণী ঘামবে
না কেন। কোন কলেজে-পড়া ফিচেল ছোকড়া নয়, সওদাগরী অফিসের
টে কেরানী নয়—দস্তুরমত জলজ্যান্ত একটি দারোগা।

তা ছাড়া, পুলিস জাতীয় জীবটির ওপর কেমন একটা ভয় ছবিরাণীর
ছেলেবেলা থেকেই। অবশ্য ছেলেপুলেদের পুলিস-ভীতি একটা থাকেই—
'পুলিসে দেব' বললেই সব দুষ্টুমি ঠাণ্ডা! কিন্তু ছেলেপুলের নাম করে এড়িয়ে
গেলেই বা শুনছে কে! অন্তত ছবিরাণী তা শুনবে কেন!

এই তো সেবার—ছবিরাণী তখন নেহাত ছোটও নয়। ফ্রক ছাড়বো
ছাড়বো করছে। তা তখন প্রায় বছর বারো এই রকম বয়স হবে বইকি
ছবিরাণীর। সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছিল ছবিরাণীদের বাড়ি। উঃ মাগো, সে
কথা মনে হলে এখনও বুক কেঁপে ওঠে ছবিরাণীর। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে
গিয়েছিল চোরটা। ধরা পড়ে জোয়ানমদ্দ বেটার সে কি কান্না! নতখুসি

মারুন বাবু—দোহাই আপনাদের পুলিসে দেবেন না···ছেলেপুলে মরবে··মারুন বাবু, রক্ত বার করে দিন মেরে···দোহাই বাবু দেবেন না।

অমন জোয়ানমদ্দ বাদের নামে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে পারে, তা দেখে ছবিরাণী ভয় পাবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

ওরা সব পারে। এইতো কয়েকমাস আগে, মামাবাড়ি কলকা· ছবিরাণী। মা-ই পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকে একটু আদব কায়দা আসার জন্য। আজকালকার ছেলেরা আবার আদব কায়দাটাই

কলকাতায় দেখে এসেছে ছবিরাণী। একদল ছেলেমেয়ে যাচ্ছিল দলবেঁধে, চিৎকার করতে করতে। কারোর বাড়িতে সিঁদ কাটেনি, কারো পাকা ধানে মইও দেয়নি! তবু ঐ লাল পাগড়ীগুলো এসে কি মারই ছেলেগুলোকে! মেরে একেবারে রক্তগঙ্গা করে দিল! ওরা সব পারে।

কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না ছবিরাণী—এ লোকটা এমন কেন! রাসবিহারী ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখ দিয় ফুড়ুস করে নিঃশ্বাস পড়ছে। এ আবার একটা দারোগা! ছবিরাণীর—কিন্তু তেমন প্রাণ খুলে হাসবার ভরসা পেল না। বালিশে মুখ গুঁজে হাসির দমকে অসম্বৃতা শ্লথনীবী ছবিরাণী ফুলে ফুলে উঠছে

পরের দিন দারোগা-স্বামীর সঙ্গে ছবিরাণী এসে উঠলো বেগমপুর থন

শহরও নয়, গ্রামও নয়—বেগমপুর একটি গঞ্জ।

একটি রেল ষ্টেশন। সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি অনেকগুলি ট্রেনই দাম্ভিকতায় ষ্টেশন কাঁপিয়ে চলে যায়—থামে মাত্র দুটি প্যাসেঞ্জর ট্রেন। তেতালায় ঝিমুতে ঝিমুতে এই ট্রেন দু'টি আসে আর যায়—তবু এই সম প্রাণচঞ্চল সজীব দেখায় বেগমপুরকে।

ব্যাপারীরা মাল কিনতে যায়, সওদাগরী অফিসে চাকরিও করে অনেকে।
ই চারপাশে আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে একটা গঞ্জ। শনিবার মঙ্গলবার হাট বসে। দূর দুরান্তর থেকে লোক আসে সওদা করতে। চুরি ডাকাতি এদিকটায় লেগেই থাকে। বেগমপুর থানার তাই অসম্ভব পসার, বেগমপুরের বাশভারী দারোগা রাসবিহারীর প্রতিপত্তিও অপ্রতিহত।
গাকে সকলে সযত্নে পরিহার করেই চলে।
দারোগার বৌ ছবিরাণী, বাঘিনী না হোক বাঘের বৌ। নকিপুরের বসময় ছবিরাণীকে সকলে অবজ্ঞা করতে পারে কিন্তু রাসবিহারীর বৌকে করবে, কার ঘাড়ে এমন মাথা আছে! তবু ছবিরাণী সকলের সাথে মিশতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু যেখানেই যাও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সকলে। মেশার চেষ্টাটা ছবিরাণী তাই ছেড়েই দিয়েছে।
বেগমপুর থানাটা সারাদিন বসে বসে ঝিমোয়। দুপুরবেলা একঘেয়ে সুরে তুলসীদাস আবৃত্তি করে সিপাই রামধারী:

ভয়উ মনোরথ সুফল তব
সুনু গিরিরাজ কুমারী
পরিহরু দুঃসহ কলেস সব
অব মিলহহি ত্রিপুরারী।

রাতে কিন্তু চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায় বেগমপুর থানার। অন্তর্হিত হয় রামধারীর শান্ত সমাহিত ভাব। কর্মব্যস্ত বেগমপুর থানা। সদরে চালান আগে কবুল করাতে হবে আসামীকে। ডাক পড়ে রামধারীর।
সব শালা ছিচকে চোর। তেল খাওয়ান পাকা বেতটা হাতে রামধারীর রুদ্ররূপ দেখলেই সব শালা কবুল করে ফেলে। হার মেনেছিল রামধারী একমাত্র ঈশেন ডাকাতের কাছে। কলজের জোর ছিল শালার! তিনটি বেত ভাঙলো, তবু রাটী কাড়লো না! কিন্তু রাসবিহারী আসতেই সেই বুনো সাপের মাথায় ধুলো পড়লো। ঈশেন দ্বীপ-চালান হবার পর আর

একটাও মরদ চোখে পড়েনি রামধারীর। এক ঘা কষালেই হাঁউমাউ করে কাঁদতে সুরু করে ভেড়ুয়ার দল।

কবুলিয়ৎ নামা লিখে সদরে চালান দেবার ব্যবস্থা করে কোয়ার্টারে ফিরতে রাত হয় রাসবিহারীর। রান্নাবান্না শেষ করে ঝিমোয় ছবিরাণী।

এক শালা কিছুতেই কবুল করবে না···দোহাই বাবু আমি কিছু করিনি··· করিসনি বেশ করেছিস···চালান দিতে হবে তো কাউকে···কবুল না করলে চল্‌বে কেন···দিলুম শালাকে দু'ঘা···ব্যাস বাছাধন সুর সুর করে কবুল করে ফেল্‌লো···সব···হ্যা বাব্বা, আমার নাম রাসবিহারী দারোগা

রূপকথার রাজপুত্র রাসবিহারী !

কাঁদলে লোকটা ? রক্ত বেরুল ?

অন্ধকার বেড়ালের মত চক্‌চক্‌ করে ওঠে ছবিরাণীর কুঁতকুঁতে চোখ দুটো। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় হাঁপায় মেয়েটা।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ে রাসবিহারী। আর ঘুমন্ত রাসবিহারীকে দেখলেই হাসি পায় ছবিরাণীর।

ঘটনাটা কি, কিছু আঁচ করতে পারছে না ছবিরাণী।

চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে বেগমপুর থানার। রামধারীর তুলসীদাস আবৃত্তি বন্ধ। কিসের যেন একটা প্রস্তুতি চল্‌ছে। বর্ষণের আগের গুমোটের মত স্তব্ধ রাসবিহারী।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো ছবিরাণী—শীতের বেগমপুর রিক্ত। পাতা ঝরতে সুরু করছে—থানার প্রাঙ্গণের নিমগাছটা রিক্তশাখা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ঢেউ উঠছে সোনালী ধানের শীষে। চোখ জুড়িয়ে আসে।

কিন্তু ঘটনাটা আঁচ করা যায় না কিছুতেই। দুপুর বেলা একবার এসে সাত তাড়াতাড়ি খেয়ে গেছে রাসবিহারী। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করেছিল

ছবিরাণী। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। মেয়ে মানুষের ওসব কথায় দরকার কি!

তালগাছের ঝাঁকড়া মাথার উপর দিয়ে, রিক্ত নিম গাছের ডাল বেয়ে একটা অতিকায় সরীসৃপের মত রাত্রি ঘনিয়ে এলো বেগমপুরে।

কিসের একটা গোলমাল। জানালায় এসে দাঁড়াল ছবিরাণী। কৃষ্ণকায় মানুষের স্রোত নেমে এসেছে বেগমপুরের মাঠে মাঠে—অন্ধকারের মাঝে একটা বিচিত্র সিলুয়েট। সমুদ্র গর্জনের মত ভেসে এলো একটা শব্দ। গর্জে উঠলো বন্দুক—একটা আগুনের ঝলক। অসহায়তার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ছবিরাণী। ওরা সব পারে!

দরজা খোল, দরজা খোল শীগ্‌গীর!

হাঁফাচ্ছে রাসবিহারী। পালিয়ে এসেছে রাসভারী দারোগা রাসবিহারী।

কিন্তু কে দরজা খুলবে। ঘরের মধ্যে বইছে একটা উত্তাল হাসির ঝড়। হাসির দমকে অসম্বৃতা ছবিরাণী ফুলে ফুলে উঠছে।

দুষমণ

পাহাড়তলীর ছোট্ট শহরটা সারাটা বছর ঝিমিয়ে থাকে। শীতের আমেজ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভীড়। তিন চারটা মাস প্রাণ-চঞ্চল দেখায় শহরটা। বিয়ের কনের মত সেজে ওঠে মনোহারী দোকানগুলি। শহর-বাজারে গায়ে গা না ঠেকিয়ে চলাফেরা করাই দায়। সারাটা বছর বাহাত্তুর-মার্কা হিন্দী বই দেখিয়ে কোন রকমে টিকে-থাকা সিনেমাটায় আসবে নতুন নতুন বাংলা বইয়ের জোয়ার। নানা রঙের শাড়ী, প্রসাধনের কড়া গন্ধ আর দামী সিগারেটের খোসবুতে সজীব হয়ে উঠবে শহরটা।

টাঙ্গাওয়ালাদের মরশুম এই সময়টা। কলকাতার গাড়ি আসার আগেই ওরা ভীড় করবে ষ্টেশনে। তারপর গাড়ি আসবে। দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ সজীব হয়ে উঠবে শহরটা। কুলী, কুলী··· যাঁদের লটবহর আছে তাঁরা তারস্বরে চেচাতে সুরু করবেন। শহুরে মেয়েটির ভালো লাগবে ইতস্তত পাহাড়ের হাতছানি। প্রাণ ভ'রে একটু মুক্ত হাওয়া টেনে নেবেন স্বাস্থ্যান্বেষী রোগাগিলগিলে ভদ্রলোক।

কুলীটা আবার কোথায় গেল! স'রে পড়বে নাকি। কুলী, কুলী···

ওজন দিতে হবে, আপনার মাল বেশি আছে। সারাটা বছর উপোসী থেকে ওরাও কিছু আশা করে এই সময়টা।

কোলকাতা থেকে এতখানি এলাম, কেউ কিছু বল্‌লে না আর আপনি···

সে বল্‌লে কি আর হয়? ওজন দিতে হবে! মাল বেশি না হ'লে ভয় কি আপনার···

যাক্‌গে দিয়ে দিচ্ছি কিছু—ঝঞ্ঝাট! হিসাবী ভদ্রলোক নগদ একটা আধুলী বের ক'রে দেন।

টাঙ্গা হবে বাবু, টাঙ্গা?

কোথা যাবেন বাবু বিলাসী ? চলুন লিয়ে যাচ্ছি

ইদিকে আসুন বাবু, লতুন টাঙ্গা। পক্ষীবাজ ঘোড়া ·

কত, নিবি কত ? দর না ক'রে উঠবেন হিসেবী ভদ্রলোক।

সবাই যা লেয়, আমি কি আর বেশি লিব বাবু

তবু কত লাগবে ?

এক টাকা দেবেন, বিলাসী যেতে আর কত লিব !

এক টাকা ? ডাকাত নাকি ! বারো আনায় যাবি ? বারো আনা ?

বারো আনা কি বাবু! লতুন টাঙ্গা !

তাহ'লে বাপু আমি পুরোন গাড়িই নেব

আচ্ছা, আচ্ছা চলুন বাবু। পুরোন গাড়িতে গিয়ে গাড্ডায় গিরবেন— আপনার সঙ্গে কি এক দিনের কারবার !··

দিন, দিন বিস্তারাটা এদিকে দিন। মনে রাখবেন বাবু ' সস্তায় লিয়ে যাচ্ছি। বিদেশী টাঙ্গাওয়ালা হামার নাম।

বারো আনার এক পয়সা কম নামবে না বিদেশী। অন্যেরা অবশ্য দশ আনায়ও যায়—কিন্তু টাঙ্গাওয়ালাদের মধ্যে একটু অভিজাত বিদেশী। চমৎকার নীল রঙ, পুরু স্প্রিংয়ের গদি আর পক্ষীবাজ ঘোড়া। ঘোড়াটা সত্যই ঈর্ষার বস্তু। মানুষ-সমান উঁচু, সাদা ধবধবে রঙ—ঘোড়াটার নাম রেখেছে রাজা।

একক্ষেপ সওয়ারী পৌঁছে দিয়ে এসে ঘোড়াটাকে একটু বিশ্রাম দেবে বিদেশী। চারটি চানা আর জল বাল্‌তীতে ক'রে প্রথমে ধ'রে দেবে রাজার সামনে।—লে আরাম কর রাজা !

পিঠের ওপর ছোট্ট একটা চাপড় দেবে বিদেশী। পাহাড়ী পথে গাড়ি টানা কি সোজা তক্‌লিফ !

তারপর চায়ের দোকান।

ক্ষেপ মেরে এসে সবাই ভীড় করে চায়ের দোকানে।

দে ওর থোড়া! দোকানী একেবারে যতটা চা দেবে তাতে কেউই খুসি হয় না ওরা—আবদার জানানোটা ওদের অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

চা-ওয়ালা অবশ্য এ আবদারে মোটেই কান দেয় না। শেষ পর্যন্ত একটু গরম জল পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় ওরা। গরম জল খয়রাৎ করতে অবশ্য কার্পণ্য করে না চা-ওয়ালা। বাঁশের চটার হাতল লাগানো সিগারেটের কৌটোটায় ক'রে জল ঢেলে দেয় তাদের গ্লাসে।

তারপর উদ্দেশ্যহীন আলাপ চলে।

আজ যা একটা সোওয়ারী উঠেছিল। ক'লকাতার লেড়কি। শালা চুলে কি খসবু গন্ধটা যেন এখনও পাওয়া যাচ্ছে এমনভাবে একটা বড় নিঃশ্বাস টেনে নেয় বাসদেও।

দেখেছিস কেমন তাকাচ্ছে রাজাটা, শালা ভারী বুঝ্‌মান আছে···

শালা সারাদিন কেবল রাজা আর রাজা—সাদী ক'রে লে রাজাকে তুই দিমাগ খারাপ ক'রে দেয় বাসদেওয়ের।·· উ শালা কি খসবু!

কথাটা সেদিন দুলালীও বলেছিল। খুন চ'ড়ে গিছল বিদেশীর। রাজার দুষমণকে দেখে লিবে। সে দুলালী হ'লেও মান্‌বে না বিদেশী।

অথচ দুলালীর কি দোষ? রাত ন'টার ট্রেনের ক্ষেপটা মেরে এসে মানুষ নাহা-খাওয়াটা সেরে নেয়। তা নয়, বিদেশী এসে লেগে যাবে ঘোড়াটাকে গোসল করাতে।

কড়া বুরুষ দিয়ে মেজে দেবে ওর সমস্ত শরীর। আরামে রাজার সাদা চামড়াটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তারপর ওকে দানাপানি দিয়ে তবে নাহা সারতে যাবে বিদেশী।

দুলালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কিন্তু কাঁহাতক সহ্য করা যায়। কতক্ষণ

খাবার আগলে ব'সে থাকবে সে। তবু যদি নিজের ঘোড়া হ'ত! ঘোড়া তো সে বঘুবর মাঝির!

গুম হ'য়ে থাকে বিদেশী। রাজার দুষমণকে সে মাফ করবে না কখনও। সে দুলালীই হোক আর যেই হোক।

কিরে নারাজ হইলি? ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে দুলালী।

ওর শরীরের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করতে পারছে বিদেশী। কিন্তু রাজার দুষমণ উ। হোক সে দুলালী!

তু রাজার দুষমণ—মাফ সে কিছুতেই করবে না দুলালীকে। রাজার দুষমণ, বিদেশীরও দুষমণ।

আমি রাজার দুষমণ হ'তে যাব কেন রে? ওকি আমার সতীন! প্রগলভ হ'য়ে ওঠে মেয়েটা। মনটা কি রকম নরম হয়ে আসে বিদেশীর। কিন্তু দুষমণ উ!

আগে রাজাকে সাদী ক'রে লে, তবে ত' উ হামার দুষমণ হবে—তখন সে দেখবি উকে কি করি হামি!

না, তুহ বহুৎ বেওকুফ আছিস! কথাটা বেশ বলছে ছুঁড়ী। সাদী… যাক্ এবারের মত মাপ ক'রে দেওয়া যেতে পারে ওকে।

মহুয়াব নেশার ঘোরটা এবার একটু অনুভব করা যায়। বিকেলে কেনা বেল ফুলের মালাটা দুলালীকে উপহার দেওয়া যেতে পারে।

গরম পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্যান্বেষীরা ফিরতে সুরু করে। ক'টা দিন খুব ব্যস্ততা। তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়বে শহর। বাজারে লোক পাতলা হ'য়ে আসবে। মিইয়ে যাবে মনোহারী দোকানের সমারোহ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মহুয়া, তাল আর শালের সারি রিক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের তলা থেকে বেরিয়ে পড়বে দগ্‌দগে লাল মাটি। দুপুরে আগুনের মত গরম হাওয়ায় ধূলির ঝড় উঠবে। জনবিরল শহরে কে আর টাঙ্গায় ওঠে। টাঙ্গার জমাই উঠতে চায় না কোন রকমে।

শহরে কি আর মানুষ থাকে এ সময়টা? থাকে তো ক'লকাতার বাবুদের সৌখীন বাড়িগুলো আগলাবার জন্য কতকগুলি মালী। খোঁপায় পলাশ ফুল গুঁজে ঘুরে বেড়ায় কিছু সাঁওতালী মেয়ে। পোষ্টাপিস আর থানার কিছু বাঙালী বাবু আর স্থানীয় বাসিন্দে কয়েকশ' ঘর। এ লোকগুলোর ঠ্যাংয়ের তাগদের বলিহারী। উঁচু নিচু পাহাড়ী বন্ধুর পথে মাইলের পর মাইল হাটতে ক্লান্তি নেই। বাজার মন্দা যায় এ সময়টা। তবু সওয়ারী দু'চার জন পাওয়াই যায়। থানার গৃহিনী পোষ্টাপিসে বেড়াতে গেলে বিদেশীর ডাক পড়ে। তা ছাড়া, খানদানি ঘরের পর্দানশীন জেনানা আছে, ইষ্টিশনে কিছু কিছু লোক সব সময়ই যাতায়াত করে। শহরে আর কোন বিশেষ যানবাহন নেই। পাহাড়ী পথে সাইকেল রিক্সা অচল, রিক্সাও নেই বললেই হয়। সুতরাং টাঙ্গাওয়ালাদের ডাক পড়বেই!

অবশ্য চেঞ্জের মরশুমে যা পাওয়া যায় তাতে এ ক'টা মাস চ'লে যাওয়ার কথা। কিন্তু হাড়কঞ্জুস এই রঘুবর মাঝি। এই বে-টাইমটাতে খানা কমিয়ে দেবে ঘোড়ার। শালা মালিক। জিনিসের যত্ন জানেনা, তবু মালিক। শালা দুষমণ উ! হোক দুলালীর চাচা। শালা দুষমণ! কিছু রোজগার করতে পারলে নিজেই কিনে লেবে রাজাকে। খেতে দেয় না মালিক। হোক দুলালীর চাচা, দুষমণ উ।

চেঞ্জের মরশুমের সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা ট্যাক্সি এসে হাজির হ'ল পাহাড়তলীর এই ছোট্ট শহরে। সামনে টাঙ্গা পড়লে পক পক ক'রে হর্ন দিতে থাকে। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠতে চায় ঘোড়া—এক পাশে সরে গিয়ে পথ ক'রে দিতে হয়।

কলকাতার লোকগুলোও যেন ট্যাক্সি পেলে ব'র্তে যায়। টাঙ্গায় এক-ক্ষেপ মারতে মারতে দু'ক্ষেপ মেরে দেয় ট্যাক্সিওয়ালা। দেমাকে পা পড়ে না শালার। হাওয়াগাড়ির গাড়োয়ান কথাই বলতে চায় না ওদের সঙ্গে।

চায়ের দোকানে একটা চাপা আক্রোশ ফেনিয়ে ওঠে।

শালার বোয়াব দেখেছিস্! দোব একদিন গাড্ডায় গিরিয়ে!

কোথায় থাকেরে শালা?

লাল চোখে ভয়ঙ্কর দেখায় এবশাদকে।

জাহান্নামে আবার কোথায়!

পেছন থেকে এসে কেবল ভোঁপো ভোঁপো—দেব একদিন শালাকে!

নীরবে চা খেয়ে উঠে যায় বিদেশী।

ঝক্‌ঝকে ট্যাক্সিটার কাছে ম্লান দেখায় ওর টাঙ্গা। পক্ষীরাজের আভিজাত্যে কেমন যেন ভাঙন ধরেছে।

ভোঁপো! ভোঁপো!

ইষ্টিশনের রাস্তা থেকে বাজারের রাস্তার বাকটা ধরতেই দেখা গেল ধুলো উড়িয়ে আসছে হলদে রঙের হাওয়াগাড়ি।

ভোঁপো! ভোঁপো!

কিন্তু রাজা কোন গাড়ির পিছনে পড়েনি আজ পর্যন্ত।

কচ্যা কচ্যা

চাবুকটা একবার ঘুরিয়ে দেয় রাজার ওপর দিয়ে। পক্ষীরাজ যেন ডানা মেলে দিয়েছে। খটাখট্ খটাখট্..পাহাড়ী পথে খুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রাত হলে দেখা যেত আগুন ছিট্‌কোচ্ছে।

করছো কি, উল্টে যাবে যে

কলকাতার মেয়েটা ভয় পেয়েছে।

না দিদিমণি, ওল্টাবে কি, আমার নাম বিদেশী। কিন্তু এগিয়ে আসছে হাওয়াগাড়ি, এগিয়ে আসছে।

কচ্যা কচ্যা, আরো জোরে, জোরসে

ঝাঁকুনী লাগছে—দু'খানা চাকার মধ্যে মড়মড় করছে কা

কচ্যা…কচ্যা—জীবনে এই প্রথম চাবুক পড়লো রাজার পিঠে

থামো থামো

চিৎকার করতে সুরু করেছে স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোক আর মেয়েটা।

ভোঁপো, ভোঁপো !

একেবারে পেছন থেকে হর্ন দিচ্ছি হাওয়াগাড়ি। শালা দুষমণ। সা

দুটো পা তুলে লাফ দিতে চাইছে রাজা।

কচ্যা…কচ্যা

পাগলের মত আর এক ঘা চাবুক কষালো বিদেশী। তারপর হাওয়াগা

একমুহূর্ত পাইপ থেকে পেট্রলের গন্ধ মেশানো খানিকটা গরম ধে

লাগলো বিদেশীর নাকে চোখে মুখে।

আদালতের মধ্যেই কাঁদতে সুরু করেছে দুলালীটা। কিন্তু জা

গেছে শালা পক্ষীরাজের দুষমণ। লোহার ডাণ্ডাটা তুলেছিল বিদেশী মোক্ষ

কিন্তু যত সব ভেড়ুয়ার দল ধ'রে ফেললো। এবশাদ, বাসদেও

বাত শালাদের। কি আর হবে, বড়জোর জেহল হবে দু'এ

দুলালী কাঁদছে, কাঁদুক। জানে বেঁচে গেল শালা দুষমণ।